শুন বরনারী

শুন বরনারী

সুবোধ ঘোষ

ক্লাসিক প্রেস, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ

পৌষ, ১৩৬৪

প্রকাশক

নারায়ণ সেনগুপ্ত

ক্লাসিক প্রেস

৩/১এ, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদ রূপায়ণ

ব্রজ রায়চৌধুরী

মুদ্রণ

শশী প্রেস

৪৫, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রচ্ছদ মুদ্রণ

নিউ প্রাইমা প্রেস

দাম তিন টাকা

লেখকের অন্যান্য রচনা

ভোরের মালতী

কুসুমেষু

গল্পলোক

ভারত প্রেমকথা

ছোট এক টুকরো কাঠের উপর বাংলা হরফে লেখা একটা নাম—ডাক্তার হিমাদ্রিশেখর দত্ত (হোমিও)। গিরিডির লোহা-পুলের পূবদিকের সরু রাস্তাটার ধারে কোন বাড়ির দরজার পাশে দেয়ালের গায়ে ঐ নামটা আজও আঁটা আছে কিনা জানি না। থাকলেও, এতদিনে নামটা নিশ্চয় পচা কাঠের ছাতা লেগে পচে গিয়েছে কিংবা পুরানো কাঠের ঘুনের কামড়ে ঝিরঝিরে হয়ে গিয়েছে। যাই হোক, আজ থেকে দশ বছর আগে ঐ নামের ফলক স্মরণ করিয়ে দিতো যে, ঐ নামের আড়ালে একটা মানুষ আছে। কে না চেনে তাকে?

নামটা শব্দের ভারে বেশ ভারিক্কি বটে, কিন্তু মানুষটা একেবারে হাল্‌কা! লোকেও এত বড় একটা নাম উচ্চারণ করবার কষ্ট স্বীকার করে না। লোকের মুখে নামটাও কাটছাঁট হয়ে বেশ হাল্‌কা হয়ে গিয়েছে। লোকে বলে, হিমু দত্ত হোমিও। কেউ কেউ আরও সংক্ষেপে সেরে দেয়, হোমিও হিমু! প্রবীণেরা অবশ্য শুধু হিমু বলেই ডাকেন। কারণ, হোমিও হিমুর বয়সটাও হাল্‌কা। প্রবীণদের কলেজে-পড়া ছেলেদের চেয়ে বয়সে বড় জোর পাঁচ বছর বেশি হতে পারে হিমু। তার বেশি কখনই নয়। কম বয়সের ছেলেরা আর মেয়েরা নিজেদের মধ্যে আলাপের সময় হোমিও হিমু বললেও হিমাদ্রিশেখর দত্তকে কোন কথা বলবার সময় হিমুদা বলেই ডাক দেয়।

সব শহরের মত এই গিরিডিতেও লোকের ঘরে বিশেষ এক-ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। অমুকের অমুক জায়গা যাবার দরকার

হয়েছে। তাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে, কারণ তার পক্ষে একা যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু পৌঁছে দেবে কে? সঙ্গে যাবে কে?

এ ধরণের সমস্যার সমাধানে সহায় হতে হিমু দত্তের মনে কোন আপত্তি নেই। আপত্তি দূরে থাকুক, বরং অদ্ভুত একটা আগ্রহের বাড়াবাড়ি আছে বলতে হবে। যে কোন পরিবারের এধরনের কাজের দরকারে হিমু দত্তকে একবার ডাক দিলেই হয়, আর অনুরোধটা একবার করে ফেললেই হয়। তখনি রাজি হয়ে যায় হিমু দত্ত।

গত বছরে পৌষ সংক্রান্তির সময় সমস্যায় পড়েছিলেন পরেশ-বাবু। পিসিমা গঙ্গাসাগর যাবার জন্য প্রতিজ্ঞা ক'রে বসে আছেন। থুড়থুড়ে বুড়ো মানুষ, এই পিসিমাকে নিরাপদে গঙ্গা-সাগর নিয়ে যাওয়া আর নিরাপদে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে আসা কি সহজ কাজ? যে-সে মানুষের পক্ষে একাজ সাধ্যই নয়। চারটিখানি দায়িত্বের কথাও নয়। পরেশবাবুর নিজেরই সাহস হয় না, এমন কি অমন হট্টাকট্টা ভাগ্নে বাবাজী বড়-খোকনের উপরেও এমন কাজে নির্ভর করবার সাহস নয় না। খায় দায় ও কসরৎ করে, আর যখন তখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়; এরকম আয়েসী কুঁড়ে আর ঘুমকাতুরে ছেলে বড়-খোকন কি পিসিমাকে গঙ্গাসাগর দেখিয়ে আনবার ঝুঁকি নিতে পার, না ওকে ঝুঁকি নিতে দেওয়া যায়?

তবে পিসিমাকে নিয়ে যাবে কে? এ-পাড়া আর ও-পাড়ার অনেক ছেলের কথাই মনে পড়ে, যাদের জীবনে কোন কাজের তাড়াই নেই। তাস খেলে, থিয়েটার করে আর খবরের কাগজের খেলার রিপোর্ট পড়ে সকাল-সন্ধ্যা তর্ক করে। এহেন কোন ছেলের হাতে পিসিমাকে গঙ্গাসাগর দেখিয়ে আনবার দায় সঁপে দিতে সাহস হয় না। প্রথম কারণ, ওদের কেউ রাজিই হবে

না। দ্বিতীয় কারণ, ওদের বুদ্ধিসুদ্ধিকে ভরসা করাও যায় না। কে জানে, হয়তো পিসিমাকে কলকাতার কোন হোটেলে ফেলে রেখে দিয়ে ময়দানের দিকে কিংবা সিনেমা হাউসের দিকে দৌড় দেবে। অভয়, ভুলু, নীহার বা রমেশ, কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না। অগত্যা হিমু দত্তকেই ডাকতে হয়েছিল। এবং হিমু দত্তও পিসিমাকে নিরাপদে গঙ্গাসাগরে নিয়ে গিয়ে, নিজে হাতে ধরে স্নান করিয়ে, এমনকি পিসিমাকে দিয়ে কপিলমুনির পুজো পর্যন্ত করিয়ে, গিরিডিতে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল। পিসিমার থুড়থুড়ে শরীরটা একটু হাঁপায়নি, একটুও ক্লান্ত হয়নি। পিসিমা নিজেই একগাল হেসে বলে ফেললেন, আহা! হিমুর মত এমন ভাল ছেলে আমি জীবনে দেখিনি পরেশ। আমাকে কোলে ক'রে গাড়িতে তুলেছে, গাড়ি থেকে নামিয়েছে। আমার গায়ে একটা আঁচড়ও লাগেনি পরেশ।

শুধু তাই নয়। গঙ্গাসাগর যাওয়া আর আসার খরচের যে হিসাব দিল হিমু দত্ত, সে হিসাব দেখে পরেশবাবুও আশ্চর্য হয়ে গেলেন। ছি—ছি, তুমি একি কাণ্ড করেছ হিমু? তোমাকে এতটা কষ্ট সহ্য করতে আমি বলিনি।

অনুযোগ করলেন পরেশবাবু। কারণ পাই-পয়সা পর্যন্ত মিল ক'রে পথের খরচের যে হিসাব দিল হিমু দত্ত, তাতে দেখা গেল যে, সাতদিনের মধ্যে হিমু দত্তের নিজের খাওয়া বাবদ মাত্র তিন টাকা খরচ হয়েছে।

হিমু দত্ত নিজেও এক গাল হেসে বলতে থাকে।—আমি হেলথ্ সম্পর্কে খুব সাবধান থাকি বড়দা। কলকাতা থেকে দু'সের চিনি আর তিন সের চিঁড়ে কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম। বাস, তাতেই আমার খোরাক হয়ে গিয়েছে। আমি মেলার কোন খাবারই ছুঁইনি। পিসিমা বরং দই-টই খেয়েছেন। আমার

বেশ ভয়ই হয়েছিল বড়দা, দই-এর লোভে পিসিমা শেষে একটা কাণ্ড না করে বসেন। ভাগ্যি ভাল, দইটা ভাল ছিল, পিসিমার শরীরে সয়ে গিয়েছিল।

পরেশবাবুর পিসিমাকে গঙ্গাসাগর দেখিয়ে আনবার পর হিমু দত্তকে যেন নতুন ক'রে চিনতে পারলেন পরেশবাবু। শুধু পরেশবাবু কেন, অনেকেই ; তারপর প্রায় সবাই।

একেবারে মাটির মানুষ, অত্যন্ত সৎ প্রকৃতির ছেলে হিমু দত্ত। পরেশবাবু একদিন ক্লাবে বসে ননীবাবুর সঙ্গে গল্প করতে করতে বলেই ফেললেন—হিমুর মত গুড-নেচার্ড ছেলের হাতে যে-কোন দায়িত্ব অনায়াসে ছেড়ে দিতে পারা যায়। ওর হাতে ক্যাশবাক্সের চাবি ছেড়ে দেওয়া যায়। পাই-পয়সার এদিক-ওদিক হবে।

ননীবাবু বলেন—তাহ'লে হিমুকেই ডেকে কাজের ভারটা চাপিয়ে দিই, কি বলেন না ?

—নিশ্চয় নিশ্চয়। মাথা নেড়ে প্রস্তাবটা সমর্থন করেন পরেশবাবু।

এবং আর দুদিন পরেই দেখা গেল, ননীবাবুর মেয়ের বিয়ের জন্য জিনিস কিনতে কলকাতায় চলে গেল হিমু দত্ত। বাসনপত্র, অলঙ্কার, কাপড়-চোপড় আর শয্যাদ্রব্য, সবসুদ্ধ প্রায় তিন হাজার টাকার বাজার করবার দায়িত্ব অনায়াসে হিমু দত্তের উপর ছেড়ে দিলেন ননীবাবু। সবসামগ্রী নিয়ে দু'দিন পরে যখন ফিরে এল হিমু দত্ত, তখন সব চেয়ে আগে খুশি হয়ে আর আশ্চর্য হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন ননীবাবুর স্ত্রী—হিমুর পছন্দ আছে বলতে হবে! কী সুন্দর ডিজাইনের গয়না! তোমার চোখ আছে, রুচি আছে হিমু। আমি নিজে কলকাতা গেলেও এরকম পছন্দ করে সুন্দর জিনিস কিনতে পারতাম না।

পাই পয়সা মিলিয়ে হিসাবও দিয়ে দিল হিমু। ননীবাবু

আশ্চর্য হয়ে বলেন—একি হিমু, তোমার খাওয়া দাওয়ার কোন খরচ নেই কেন ?

হিমু হাসে—খরচ হয়নি। আমার ছেলেবেলার বন্ধু কানাই-এর সঙ্গে ট্রেণে দেখা হয়ে গেল। কলকাতাতে কানাইদের বাড়িতেই ছিলাম। কাজেই…

ননীবাবু বলেন—যাই হোক, তোমার হাতখরচ বাবদ যদি দশটা টাকা তুমি রাখতে, তাহলে ভালই হতো হিমু।

হিমু আরও লজ্জিত হয়ে হাসে—কি যে বলেন মেসোমশাই !

ননীবাবুর স্ত্রী এবার ননীবাবুরই মুখের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন—ছি, ছি। তুমি হিমুকে কি পেয়েছ ; কি বলছো তুমি ?

ননীবাবু—কেন ? অন্যায় কিছু বলছি কি ?

ননীবাবুর স্ত্রী বলেন—হিমু কি তোমার মত ইন্‌সপেক্টর যে টুরে বের হয়ে ব্রাঞ্চ অফিসের বাবুদের বাড়ীতেই দুবেলা চব্য-চোষ্য গিলবে, আর কোম্পানির কাছে খোরাকী বাবদ বিশটাকা বিল দাখিল করবে ?

ননীবাবু ভ্রূকুটি করেন—তুমি আবার হঠাৎ এসব আবোল তাবোল কথা তুলে…

হিমু দত্তই এইবার ননীবাবুর স্ত্রীর মুখের দিকে উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে অনুযোগ করে—ছিঃ, আপনি এসব কি বলছেন মাসিমা !

শহর থেকে দূরে যাবার কাজ পড়লেই, একদিন বা দুদিনের জন্য বাইরে যাবার দরকার পড়লেই হিমু দত্তের কথা সবারই মনে পড়ে।

ননীবাবুর এই মেয়ের বিয়েতে জামালপুরে গিয়ে বরের বাড়ীতে অধিবাসের তত্ত্ব পৌঁছে দেবার দায়িত্ব হিমু দত্তকেই বহন করতে হয়েছিল। অধিবাসের জিনিস দেখে বরের বাড়ীর মেয়েরা নাক কুঁচকেছিল, অনেক কটু কথাও শুনিয়েছিল। সবই শুনেছিল হিমু দত্ত, কিন্তু এই সামান্য কথাটাও বলতে পারেনি যে, আমাকে এসব কথা শুনিয়ে লাভ কি ? আমি মেয়ের বাড়ীর কেউ নই।

এই অপমান সহ্য করবার দায়িত্বটাও অনায়াসে পালন করতে পেরেছিল হিমু দত্ত। বরের বাড়ির মন্তব্যগুলিকে তুচ্ছ করতে পারেনি হিমু দত্ত। ননীবাবুর অপমানকে পরের অপমান বলেও মনে করতে পারেনি। অদ্ভুত এই হিমু দত্তের মন ; বরং সেই অপমানকে যেন ভাল করে গায়ে মেখে, যেন ননীবাবুর মেয়ের দাদাটির মত ভীরু হয়ে কাঁচুমাচু মুখ নিয়ে বরের মায়ের কাছে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে ক্ষমা চেয়েছিল হিমু দত্ত।—ত্রুটি হয়েছে, স্বীকার করছি, নিজগুণে মার্জনা করুন।

ননীবাবুর মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবার পর, অনেকদিন পরে এই ঘটনার কথা জানতে পেরেছিলেন ননীবাবু ও তাঁর স্ত্রী। হিমু দত্ত বলেনি। বরং বরের বাড়ির চাল-চলন আচার-ব্যবহারের অনেক প্রশংসা করেছিল হিমু—চমৎকার ভদ্রলোক ওঁরা।

ননীবাবুর মেয়ে নিজেই যেদিন শ্বশুর বাড়ি থেকে প্রথম বাপের বাড়ি এল, সেদিন মেয়ের মুখ থেকেই ঘটনার কথা জানতে পেরেছিলেন ননীবাবু ও তাঁর স্ত্রী। খুব বেশী আশ্চর্য হয়েছিলেন দুজনেই, হিমু দত্তের মনটা কি মানুষের মন ? মানুষ এত ভালও হয় ? পরের জন্য মানুষ এতটা সহ্যও করে ?

হিমুকে ডেকে ননীবাবু হিমুর উপর বেশ রাগ করে বলেছিলেন—ওসব কথা সহ্য করা তোমার খুবই ভুল হয়েছে হিমু। ওদের মুখের উপর শক্ত করে দু'চারটে কথা তোমারও বলে দেওয়া উচিত ছিল। তাতে যদি বিয়ে ভেঙে যেত, তবে যেত। আমি কোন পরোয়া করতাম না।

চোখের ছানি অপারেশন করবার জন্য পাটনা যাবার কথা ভেবে যেদিন দুশ্চিন্তা করেছিলেন অনাথবাবু, সেদিন অনাথবাবুর ছেলে মণ্টুই অনাথবাবুকে মনে পড়িয়ে দিল—ভাবছো কেন বাবা ?

অনাথবাবু—ভাবতে হচ্ছে রে মণ্টু। আসানসোলে হারুকে

লিখেছিলাম : কিন্তু হারু জানিয়েছে, এখন ছুটি পাবে না। আসতেই পারবে না। হারুর এখন ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষা।

মণ্টু বলে—হিমুদাকে একবার বললেই তো···

—হ্যাঁ হ্যাঁ! মণ্টুর মা'ও খুশি হয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন!—হিমু থাকতে ভাবনা করছো কেন ?

অনাথবাবুরও মনে পড়ে যায়, ঐ হিমুই যে এই গত মাসে নিত্যানন্দবাবুর ছেলেটার কার্বঙ্কল অপারেশন করাবার জন্য ছেলেটাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিল। নিত্যানন্দবাবু নিজে বাতের ব্যথায় অনড় হয়ে ঘরে পড়ে আছেন। বাড়িতে দ্বিতীয় একটা মানুষ নেই যে ছেলেটাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে পারে। একটা কার্বঙ্কল রুগীকে ভালভাবে নিয়ে যাওয়াও তো যা-তা কাজ নয়। তা ছাড়া আরও অনেক কারণ আছে, যে-জন্য নিত্যানন্দ-বাবুর মেজ শ্যালক মশাই এত কাছে, ঐ জগদীশপুরে থাকতেও এই দায়িত্বটি নিতে রাজি হলেন না। নিজের শরীরের অসুখের ছুতো ক'রে কাজের দায় এড়িয়ে গেলেন। কে জানে, অপারেশনের পর কি হবে পরিণাম ? ছেলেটা যদি মরে যায় ? যদি নিয়ে যাবার পথেই ছেলেটার মরণ-টরন হয়ে যায়, তবে ? তবে ছেলের বাপ-মা'র সন্দেহ অভিশাপ আর খোঁটা যে সারা জীবন সহ্য করতে হবে। এ ধরণের ভয়ানক ঝঞ্ঝাটের মধ্যে না যাওয়াই ভাল।

নিত্যানন্দবাবুর কাছেই শুনেছিলেন অনাথবাবু—হিমু না থাকলে আমার ছেলেটা মরেই যেত অনাথবাবু। আমি তো প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারিনি যে, হিমু এই ভয়ানক দায়িত্ব নিতে রাজি হবে। কিন্তু, কি আশ্চর্য, একবার অনুরোধ করা মাত্র হিমু রাজি হয়ে গেল। আরও কি কাণ্ড করেছিল হিমু, জানেন ?

—কি কাণ্ড ?

—অদ্ভুত রেসপন্‌সিবিলিটি বোধ। হাসপাতালের ডাক্তারদের

ধরাধরি করে স্পেশ্যাল পারমিশন নিয়ে দশটা দিন হাসপাতালেরই ওআর্ডের বারান্দায় কম্বল পেতে একটা ঠাঁই করে নিয়েছিল হিমু। ছেলেটার কাছ থেকে একঘণ্টার জন্যেও দূরে সরে থাকতে পারেনি।

অনাথবাবুর আহ্বান, একটা অন্ধ মানুষকে পাটনা পর্যন্ত নিয়ে যাবার আহ্বান! তার মানে সব সময় অনাথবাবুকে হাত ধরে ওঠাতে বসাতে আর চলাতে হবে। মণ্টুর মা কেঁদেই ফেলেছিলেন—তুমি পারবে তো হিমু?

হিমু বলে—পারি কিনা দেখতেই পাবেন।

মণ্টুর মা'ও সঙ্গে ছিলেন, এবং গিরিডি থেকে পাটনা পর্যন্ত সারাটা পথ যেতে যেতে স্বচক্ষেই দেখতে পেয়েছিলেন, হিমু নামে এই ছেলেটা পরের জন্য, অকারণ এবং কোন উপকার আশা না করে, একটা পয়সা না ছুঁয়েও কি করতে পারে।

ঘন ঘন সিগারেট খাওয়া অভ্যাস আছে অনাথবাবুর। মণ্টুর মা নিজেই দেখলেন, যতবার সিগারেট খেলেন অনাথবাবু, ততবার হিমুই দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরাতে সাহায্য করলো। হিমুই অনাথবাবুকে সাবধান করে দেয়—খবরদার জেঠামশাই, নিজে দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরাতে চেষ্টা করবেন না। মুখে ছেঁকা লেগে যাবে। যখনই দরকার হবে, আমাকে বলবেন।

হিমু দত্তেরই-বা এত সময় হয় কি করে? ওর জীবনটা কি একটা অফুরান অবসরের, কিংবা খাওয়া-পরার ভাবনা থেকে মুক্ত একটা নিরুদ্বিগ্ন কর্মহীন জীবন? দরজার পাশে দেয়ালের গায়ে ছোট কাঠের ফলকে ওর নামের সঙ্গে ওর একটা কাজের পরিচয়ও যে লেখা আছে। ডাক্তার, ডাক্তার হিমাদ্রিশেখর দত্ত। কিন্তু ডাক্তারী করে কখন? কেউ কি আজ পর্যন্ত হিমু দত্তকে কোনদিন ডাক্তারী করতে দেখেছে? হিমু দত্তের ঘরের ভিতর একটা তক্তাপোষের উপর হোমিওপ্যাথি ওষুধের একটা বাক্স অবশ্য

আছে, চিকিৎসার একটা বইও আছে। এই দুই জিনিস অনেকেরই চোখে পড়েছে। কিন্তু রোগী দেখছে হিমু দত্ত, কিংবা রোগীকে ওষুধ দিচ্ছে হিমু দত্ত, এমন দৃশ্য আজ পর্যন্ত কারও চোখে পড়েনি।

কে না জানে, চার বাড়িতে ছেলে পড়ায় হিমু দত্ত। সকাল বেলা দু'বাড়ি, সন্ধ্যাবেলা দু'বাড়ি। হিমু দত্তের বিদ্যের জোর কত আর কেমন, এ প্রশ্নও কেউ করেনি। হিমু দত্ত যাদের পড়ায়, তাদের বয়স চার-পাঁচ বছরের বেশি নয়, বিদ্যে নামে কোন বস্তুই যাদের মনে মাথায় বা চোখের চাহনিতে নেই। ছেলে-মেয়েদের বয়স যখন সাত-আট হয়, এবং ছেলে-মেয়েদের বিদ্যে শেখাবার জন্য বাপ-মায়েরা যখন সত্যিই সিরিআস হন, তখন শুধু হিমু দত্তকে ছাড়িয়ে দিয়ে একটু ভাল শিক্ষিত মাস্টার রাখবার কথা মনে পড়ে। হিমু দত্তকে তখন ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সেজন্য হিমু দত্তের মনে কোন দুঃখ নেই। কারণ, সেইদিনই অন্য এক বাড়িতে একেবারে বিদ্যাশূন্য এবং শুধু হাতে-খড়িতে অভিজ্ঞ চার-পাঁচ বছর বয়সের ছেলে-মেয়েকে পড়াবার নতুন একটা কাজ পেয়ে যায় হিমু দত্ত !

তাছাড়া, হিমু দত্ত সত্যিই পড়ায় কিনা, সেটুকু খোঁজ রাখার দরকারও যেন কোন বাপ-মা অনুভব করেন না। ছেলে-মেয়ে কটা নতুন বানান শিখলো, এবং দু-এর ঘর নামতাটুকু আয়ত্ত করলো কিনা, মাস্টার হিমু দত্তের কাছে এই সামান্যতম দাবীর প্রশ্নও যে কারও নেই। ছেলে-মেয়েগুলো দুটো ঘণ্টা হিমু দত্ত নামে মাস্টারের কাছে চুপ করে বসে থাকে, তাই যথেষ্ট। পড়ার অভ্যাসটা গড়ে উঠছে, এখন এর চেয়ে বেশি আর দরকারই বা কি ?

কাঠের ফলকে ডাক্তার কথাটা এত স্পষ্ট করে লেখা থাকলেও হিমুকে কোনদিন ডাক্তার বলে ভাবতেই পারেনি শহরের মানুষ,

বিশেষ করে ভদ্রলোকেরা। বরং হিমু মাস্টার বললে সকলেই বুঝতে পারে, ঐ সেই ছেলেটি, দেখতে মন্দ নয়, স্বভাবটি বড় শান্ত, বড় কর্মঠ, আর কেমন একটু, অর্থাৎ ঠিক বোকা নয়, একটু বোকা-বোকা। অর্থাৎ খুব বেশি ভালমানুষ হলে যা হয়, তাই।

হিমু দত্তের ডাক্তারীটা কি সত্যিই একেবারে অস্তিত্বহীন একটা কথা মাত্র? ভদ্রলোকেরা জানেন না, কিন্তু বস্তির কেউ-কেউ, মুচিপাড়ার অনেকেই, এবং শহর থেকে বেশ দূরে কয়েকটা গাঁয়ের তুরী আর দোসাদদের মধ্যে কেউ-কেউ জানে, একটা টাকা হাতে তুলে দিলে কোন আপত্তি না করে হিমদারিবাবু ডাগদারি ক'রে চলে যাবে। হেঁটেই চলে আসবে; টাঙ্গা ভাড়া চাইবে না। ওষুধ দিলে বড় জোর ছয় আনা দাম চাইবে, তার বেশি নয়।

কিন্তু হোমিও হিমু কোন রোগীকে সত্যিই ওষুধ খাওয়াবার সুযোগ পেয়েছে কিনা সন্দেহ। যারা ডাগদারির নামে ভয় পায়, ডাগদারিকে ভয়ানক সন্দেহ করে, যাদের ডাগদারিতে কোন বিশ্বাস নেই, তারাই শুধু হোমিও হিমুকে ডাক দেয়। ভুগে ভুগে মরণদশার শেষ অধ্যায়ে পৌঁছে রোগী যখন থেমে থেমে শ্বাস টানে, তখন ডাক পড়ে হোমিও হিমুর। আর, হিমু দত্ত একেবারে তৈরি হয়েই রওনা হয়। পকেটে ওষুধের শিশি থাক বা না থাক, একটি লুঙ্গি আর একটি গামছা সঙ্গে নিয়ে যেতে কখনও ভুলে যায় না হিমু দত্ত। জানে হিমু দত্ত, রোগীর মরা মুখ দেখতে হবে; মৃতের শ্মশানযাত্রা এবং দাহকার্যে একটু আধটু সাহায্য করে এবং একেবারে স্নান সেরে আসতে হবে।

এক বছর আগেও এই গিরিডির কোন পাড়াতে হিমু দত্তকে ঘুরে বেড়াতে কেউ দেখেনি। কবে হিমু দত্ত এখানে এল, আর লোহার পুলের পুবদিকের ঐ সরু রাস্তার ধারে একটা ঘরে ঠাঁই

নিল, তাও কেউ মনে করতে পারেনা। কোথা থেকে এসেছে হিমু দত্ত, তাও কেউ জানে না।

হিমু দত্ত একটা হঠাৎ আবির্ভাব। দরজার পাশে ঐ প্রকাণ্ড নামের ফলক দেখে প্রথম প্রথম যারা আশ্চর্য হয়ে খোঁজ নিয়েছিল, তারাও আজকাল আর আশ্চর্য হয় না। মানুষটা নামেই প্রকাণ্ড, কিন্তু জীবনে একেবারে সামান্য। ডাক পিয়নও আশ্চর্য হয়ে যায়। পাড়ার সব মানুষের নামে মাসে অন্তত একটা না একটা চিঠি আসে, কিন্তু হোমিও হিমুর নামে একটাও না। আপন জন বলতে পৃথিবীতে ওর কি কেউ নেই?

আরও আশ্চর্যের কথা, এক বছরের মধ্যে শহরের এতগুলি মানুষের ঘরোয়া জীবনের সঙ্গে এত পরিচিত হয়ে উঠলেও হিমু যেন একটা একঘরে প্রাণীর মত পড়ে আছে। কেউ একবার জানতেও চেষ্টা করেনি, একটা প্রশ্নও করেনি, তুমি এর আগে কোথায় ছিলে হে হিমু? তোমার দেশ কোথায়? বাপ-মা কোথায় আছেন? সত্যিই আছেন কি? না, বিগত হয়েছেন? ছোট ভাই-বোন আছে কি? বিয়ে-টিয়ে করে ফেলেছ কি?

কেউ না, এই এক বছরের মধ্যে হিমু দত্ত কোন মানুষের কাছ থেকে এতটুকু কৌতূহলও আকর্ষণ করতে পারেনি। হিমু দত্ত শুধু হিমু দত্ত। ভাড়া ঘরে থাকে, আপন ঘর নেই। কিন্তু এপাড়া আর ওপাড়ার সব ঘরই যেন ওর ঘর। কেউ একবার ডেকে একটা কথা বললেই হিমুর মুখের ভাষায় সেই ব্যক্তি সেই মুহূর্তে একটা না একটা আপনজন গোছের মানুষ হয়ে যায়। হয় কাকাবাবু, মেসোমশাই, জেঠামশাই আর পিসেমশাই, কিংবা মামাবাবু। নয়, বড়দা মেজদা সেজদা ও ছোড়দা। ঠাকুমা ও দিদিমা পাতিয়ে ফেলতেও একটুও দেরি হয় না হিমু দত্তের।

ওভার্সিআর বাবুর মা হিমু দত্তকে চিনতেন না। পথে দেখা

হতে তিনিই একদিন ভুল করে ডাক দিয়ে বলেছিলেন—তুমি তো আমাদের টুনকির ভাসুরপো ?

সেই মুহূর্তে উত্তর দিয়েছিল হিমু দত্ত—না দিদিমা, আমি হিমাদ্রি।

—তুমি বারগণ্ডায় থাক ?

—না। আমি ওদিকের ঐ লোহার পুলের দিকে থাকি।

—বলি, তুমি কি গিরিডির ছেলে ?

—হ্যাঁ, এখন তো তাই।

—কি আশ্চর্য, হিমাদ্রি টিমাদ্রি নাম তো কখনো শুনিনি।

হিমু দত্ত হাসে—আমি হিমু।

চোখ বড় ক'রে হেসে ওঠেন দিদিমা—তাই বল। তুমিই হিমু ?

—হ্যাঁ দিদিমা।

—তা হলে আমার একটু কাজ করে দে না ভাই।

—বলুন !

—আজ সন্ধ্যায় একবারটি এসে আমাকে মকতপুরে সান্যালদের বাড়িতে কীর্তন শুনিয়ে নিয়ে আসবি। রাত্রিবেলা আমি চোখে বড় ঝাপ্সা দেখি রে ভাই, একা পথ চিনে বাড়ি ফিরতে পারি না।

—বেশ, কিন্তু আপনি কোথায় থাকেন দিদিমা ?

—ওরে আমি যে হাবুল ওভারসিআরের মা।

—ঠিক আছে।

হ্যাঁ, ঠিক যেমন স্পষ্ট করে কথা দিয়েছিল হিমু, তেমনি একেবারে ঠিক সময়ে এসে প্রতিশ্রুতি পালন করে চলে গিয়েছিল।

মকতপুরের সান্যালদের বাড়ি থেকে কীর্তন শুনে বাড়ি ফেরবার পথে দিদিমা অনেক গল্প করলেন।—হাবুলের বাবা বেঁচে থাকলে আজ আর আমাকে হেঁটে পথ চলতে হতো না ভাই। তিনি ছিলেন ঝুমরা রাজ এস্টেটের ম্যানেজার। কত টাকা রোজগার

করলেন, আর দান ক'রে ক'রে ফতুর হলেন। মোটর গাড়িটাকে পর্যন্ত বেচে দিয়ে বাংলাদেশের বন্যার চাঁদা পাঠিয়ে দিলেন। হ্যাঁ, তবে, এমন কিছু দুঃখের মধ্যে রেখে যাননি। মেয়েদের বড় বড় ঘরে বিয়ে দিয়েছেন। মেয়েরা আমাকে সাহায্য করে। সুষমা আছে কলকাতায়, ধীরা কানপুরে আর অনিলা জামসেদপুরে। অনিলা এখন পোয়াতি ; এদিকে জামাই-এর বদলির অর্ডার হয়েছে। বল দেখি, কি বিপত্তি !

দিদিমা তাঁর ঘরোয়া জীবনের কাহিনী শেষ করলেন, যখন ঘরের দরজার কাছে পৌঁছলেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে ভুলেই গেলেন ; হিমু নামে এই মানুষটার ঘরোয়া সুখ দুঃখের কোন সংবাদ, কোন পরিচয়। মনেই পড়ে না কারও, হিমু দত্তেরও কোন দুঃখ থাকতে পারে, কিংবা হিমু দত্তেরও জীবনের হয়তো একটা সুখের ইতিহাস আছে। আশ্চর্যের ব্যাপার, হিমু দত্তকে কি সত্যিই একেবারে সুখ-দুঃখের অতীত একটা স্বয়ম্ভু সত্তা বলে মনে করে সাবাই ?

শহরের জীবনে সারা বছরের মধ্যে অনেক উৎসবও দেখা দেয়। পারিবারিক উৎসব। অমুকের মেয়ের বিয়ে। অমুকের ছেলের বৌ-ভাত। কিংবা অমুকের বাবার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান উপলক্ষে ভোজের নিমন্ত্রণ। কিন্তু হিমু দত্ত সবারই এত পরিচিত হয়েও কি সব উৎসবে নিমন্ত্রণ পায় ? না। ননীবাবুর মেয়ের বিয়েতে অবশ্যই নিমন্ত্রিত হয়েছিল হিমু দত্ত। এবং মণ্টুর পৈতের সময় অনাথবাবু নিজে হিমু দত্তের ঘরে এসে নিমন্ত্রণ করে গিয়েছিলেন। যাদের কাজের দরকারে হিমু দত্ত খেটেছে, তাদের কোন উৎসবের দিনে তারা হিমু দত্তকে স্মরণ করতে ভুলে যায় না। কিন্তু তা ছাড়া আর কেউ না। এই তো গত ফাল্গুন মাসে মাইকা মার্চেণ্ট রামসদয়বাবু তাঁর মা-এর শ্রাদ্ধের ঘটা দেখাতে গিয়ে গর্ব করেই বলেছিলেন, গিরিডির একটি বাঙ্গালীও নিমন্ত্রণে বাদ পড়বে না। আর

এক প্রকাণ্ড লিস্ট ক'রে রামসদয়বাবুর চার ছেলে গিরিডির সব পাড়া ঘুরে প্রত্যেক বাঙ্গালীকে, বাড়িসুদ্ধ সবাইকে নিমন্ত্রণ ক'রে এসেছিল। এমন কি ডাক বাংলাতে, ধর্মশালাতে, আর হোটেল-গুলিতেও খোঁজ নেওয়া হয়েছিল, কোন বাঙ্গালী সেখানে আছে কিনা। যারা ছিল, তারা সবাই নিমন্ত্রিত হয়েছিল। পোস্ট মাস্টার নাগেশ্বরবাবু, যিনি বিহারী কায়স্থ, কিন্তু গৃহিণী হলেন বাঙ্গালী মহিলা, তিনিও নিমন্ত্রিত হলেন। অথচ লোহাপুলের পূবদিকের সরু সড়কের ধারে একটি ক্ষুদ্র ঘরের দরজার পাশে দেওয়ালের গায়ে কাঠের ফলকের উপর লেখা এত বড় একটা বাঙ্গালী নাম কারও চোখেই পড়লো না। বাদ পড়লো শুধু হোমিও হিমু।

রাগ করেনি হিমু দত্ত। এর জন্য কোন ক্ষোভ আর কোন অভিমানে বিচলিত হয়নি হিমু দত্তের মন। সন্দেহ হতে পারে, হিমু দত্ত নিজেকে বাঙ্গালী বলে মনে করে কিনা।

যাই মনে করুক হিমু, কিন্তু হিমু দত্তের স্বভাব আর আচরণ যে বাঙ্গালী অবাঙ্গালী প্রভেদটুকুর ধার ধারে না, তার প্রমাণও একদিন পাওয়া গেল।

নবলকিশোরবাবু ওকালতী করেন। গোঁড়া সনাতনী মানুষ। অনেকদিন আগে সরদা আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করবেন বলে তৈরি হয়েছিলেন। এ হেন মানুষও এমন এক সমস্যায় পড়লেন, যে-সমস্যার সমাধানে তিনি শেষ পর্যন্ত হিমু দত্তকেই স্মরণ করতে বাধ্য হলেন।

নবলকিশোরবাবুর মেয়ে কৃষ্ণা। কৃষ্ণাকে বার বছর বয়সেই বিয়ে দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন নবলকিশোরবাবু, কিন্তু কৃষ্ণার মা'র কঠোর আপত্তিতে শেষ পর্যন্ত উৎসাহ হারিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, কৃষ্ণার লেখাপড়া শেখার চেষ্টাকেও বাধা দিতে

পারেননি, কৃষ্ণার মা'র জেদের জন্যই। কৃষ্ণার মা'র আর একটা শখ, মেয়েকে শান্তিনিকেতনে পড়াবেন। কৃষ্ণার মা'র এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করে শেষে শান্ত হয়ে গেলেন নবলকিশোরবাবু।

কৃষ্ণার বয়স সতর-আঠার, দেখতে বেশ বড়-সড়, এবং সেটা ভাল স্বাস্থ্যের জন্যই। এই মেয়েকে শান্তিনিকেতনে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। কিন্তু দিয়ে আসবে কে?

নবলকিশোরবাবু নিজে যেতে পারবেন না। ট্রেনে চড়লেই তিনি বমি করে ফেলেন। শরীর ভয়ানক অসুস্থ হয়ে যায়। কৃষ্ণার কাকা বা দাদা কেউ গিরিডিতে নেই, নিকটেও নেই। দু'জনেই আর্মড ফোর্সের সার্ভিসে পুনাতে আছে। অতএব?

এক্ষেত্রে কৃষ্ণার মা'র উদারতাও ভয়ানক সাবধান। জুনিঅর উকিল আউধবিহারী নিজেই যেচে নবলকিশোরবাবুর কাছে প্রস্তাব করেছিল, যদি দরকার মনে হয়, তবে আমিই কৃষ্ণাকে শান্তিনিকেতনে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি। কৃষ্ণার মা বললেন—না।

সম্পর্কে আত্মীয় হয়, ব্রিজমোহনবাবুর ছেলে দেবকীদুলালের কথাও মনে পড়েছিল। না, কৃষ্ণার মা বেশ কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে আপত্তি করলেন। এবং কৃষ্ণার মা নিজেই একদিন মন্দির থেকে ফিরে এসে নবলকিশোরবাবুর কাছে বললেন—মণ্টুকা মা কহতি হ্যায় কি···

—কি? কেয়া কহতি হ্যায়? প্রশ্ন করেন নবলকিশোরবাবু।

কৃষ্ণার মা বলেন—কহতি হ্যায় কি হিমুকো বোলো। বস্, আউর কুছ সোচনে কা বাত নেহি।

কৃষ্ণাকে শান্তিনিকেতনে পৌঁছে দিয়ে আসুক হিমু। হিমুকে ডাকা হোক। হিমু নামে ছেলেটির মতিগতি সম্বন্ধে কৃষ্ণার মা'র এই অদ্ভুত নির্ভয় নির্ভরতা আর বিশ্বাসের রকম দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন নবলকিশোরবাবু। কিন্তু রাজি হলেন।

কৃষ্ণাকে শান্তিনিকেতনে পৌঁছে দিয়ে হিমু যেদিন ফিরে এসে নবলকিশোরবাবুর সঙ্গে দেখা করলো আর যাওয়া-আসার খরচের হিসাব দাখিল করলো, সেদিন একেবারে অবাক হয়ে হিমুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন নবলকিশোরবাবু। তারপর বললেন—এ বেটা, তু নে এ কেয়া কিয়া ?

হিমু বলে—কি করেছি চাচাজী ?

হিসাব দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছেন নবলকিশোরবাবু। কৃষ্ণা ট্রেনের ডাইনিং কারে গিয়ে দু'বার খাবার খেয়েছে। খরচ পড়েছে ছ'টাকা দশ আনা। আর, হিমু যেতে আসতে শুধু চারবার পুরি-তরকারী খেয়েছে, খরচ হয়েছে দেড় টাকা।

নবলকিশোরবাবু—তু বেটা এক পিয়ালি চা ভি নেহি পিয়া ?

—আমি চা খাই না চাচাজী।

শান্তিনিকেতন থেকে কৃষ্ণার প্রথম চিঠি পাওয়ার পর নবল-কিশোরবাবুর সনাতনী চোখের শেষ সন্দেহের লেশটুকুও যেন প্রচণ্ড খুশির চমক লেগে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কৃষ্ণার মা বলেন—অব্ বোলো, অ্যায়সা লেড়কা দেখা কভি ?

কৃষ্ণা লিখেছে, হিমু ভাইজীকে আমার বহুৎ বহুৎ নমস্কার জানাবে। পথে আমার একটুও কষ্ট হয়নি। হিমু ভাইজী আমাকে একটুও কষ্ট পেতে দেয়নি। যতবার আমার জল তেষ্টা পেয়েছে, ততবার নিজে ব্যস্তভাবে ছুটে গিয়ে গার্ডের কামরা থেকে ভাল জল নিয়ে এসেছে; আমাকে পানিপাঁড়ের হাতের ময়লা জল খেতে দেয়নি।

হিমু দত্ত নামে মানুষটার আত্মা আছে ঠিকই, কিন্তু সেটা বোধহয় একটা আত্মা মাত্র। না বাঙ্গালী, না বিহারী, না অন্য কিছু। নবলকিশোরবাবু না, কৃষ্ণার মা'ও না, দু'জনের কেউ মনে করতেই পারেন না যে, হিমু দত্ত বিহারী নয়, বাঙ্গালী।—হিমু

তো বিলকুল হিমুহি হ্যায়। নবলকিশোরবাবু আশ্চর্য হয়ে যে অর্থহীন কথাটা বলেন, সেটাই বোধহয় হিমুর সব চেয়ে সার্থক পরিচয়।

কৃষ্ণার মা'র কাছ থেকেই গল্পটা, অর্থাৎ কৃষ্ণার চিঠির কথা-গুলি শুনতে পেলেন মণ্টুর মা। তারপর আরও অনেকে শুনলেন। হিমুর কাছে বিশ্বাস করে কিনা ছেড়ে দেওয়া যায়? নইলে নবলকিশোরবাবুর মত গোঁড়া মানুষ তাঁর মেয়েকে, কৃষ্ণার মত একটি সুন্দর আঠার বছর বয়সের মেয়েকে নিশ্চিন্ত মনে হিমুর কাছে ছেড়ে দিতে পারতেন না।

হিমু দত্তের একটা নতুন সুখ্যাতি অনেকেরই মুখের কথায় গুনগুন করে। বড় ভাল ছেলে। একেবারে নির্দোষ স্বভাব। এবং পূজোর ছুটির পরে হিমুর এই সুখ্যাতির গল্পটা অনেকেই স্মরণ করতে বাধ্য হয়। কারণ, সমস্যা দেখা দিয়েছে। এক বাড়ির সমস্যা নয়, এপাড়া আর ওপাড়া নিয়ে পাঁচ বাড়ির সমস্যা। নিভার বাবা ভাবেন, প্রমীলার মা ভাবেন, সরযূর দাদা ভাবেন, কল্যাণীর মামা ভাবেন, এবং অতসীর কাকিমা ভাবেন। মেয়ে-গুলিকে কলকাতায় পৌঁছে দেবার সেই সমস্যাটা আবার কঠিন হয়ে দেখা দিয়েছে।

কলেজের ছুটির আগে এবং পরে, এই সমস্যাটা দেখা দেয়। এবং উপায় চিন্তা করতে করতে হয়রাণ হতে হয়। কোন বাড়ির বাপ-মা বা অভিভাবক, কেউই পছন্দ করেন না যে, মেয়েটা একা একা যাওয়া-আসা করুক। মেয়েরাও চায় না। ট্রেন যাত্রার হয়রানিকে ওরা ভয় করে। এবং একা একা যাওয়া-আসা করতেও ভয় করে। কে পৌঁছে দিয়ে আসবে? কে নিয়ে আসবে? কার এত সময় আছে? প্রত্যেকবার এই অসুবিধার প্রকোপে পড়ে

মেয়েগুলির যাওয়া-আসার তারিখ পিছিয়ে দিতে হয়। ছুটি শেষ হয়, তবু নিভা কলকাতা রওনা হতে পারে না। কখনো বা ছুটি আরম্ভ হয়ে যায়, ছুটির চারটে দিন পার হয়ে যায়, কলকাতার ছাত্রী হোস্টেল থেকে প্রমীলার ছুটো রাগন্ত চিঠি এসেও যায়, তবুও প্রমীলার মা মেয়েকে কলকাতা থেকে আনাবার ব্যবস্থা করে উঠতে পারেন না।

কিন্তু এবছর পূজার ছুটি ফুরিয়ে যাবার দিনটাকে কাছে এগিয়ে আসতে দেখেও চিন্তা করতে ভুলে গেলেন সবাই। কারণ, সবারই মনে পড়েছে, হিমু আছে। হিমু থাকতে চিন্তা করবার কি আছে?

সব মেয়ে এক কলেজে পড়ে না, এবং সবারই কলেজের ছুটি একই দিনে ফুরোয় না। কাউকে ছুদিন আগে রওনা হতে হয়, কাউকে ছুদিন পরে! সরযূ যায় সবার শেষে।

এটাও একটা সমস্যা। হিমু কি দফায় দফায় কলকাতা দৌড়বে আর আসবে? পাঁচটি ছাত্রীই কি একত্র হয়ে হিমুর সঙ্গে যেতে পারে না?

ব্যবস্থা হয়, সবাই একই দিনে একই সঙ্গে যাবে। নিভাকে আর প্রমীলাকে সোজা হোস্টেলে তুলে দিয়ে হিমু অতসীকে মির্জাপুর স্ট্রীটের মাসিমার বাড়িতে, কল্যাণীকে বালিগঞ্জে বড়দির বাড়িতে, আর সরযূকে আলিপুরে ছোটমামার বাড়িত পৌঁছে দিয়ে আসবে।

তা তো হলো। কিন্তু হিমু কি সেদিনই কলকাতা থেকে গিরিডি ফিরে আসবে?

না। কল্যাণীর মামা বলেন—না! অতসীর কাকিমা বলেন —না। সরযূর দাদা বলেন—না। 'তোমাকে আরও কয়েকটা দিন কলকাতায় থাকতে হবে হিমু। তুমি নিজে মেয়েটাকে একেবারে হোস্টেলে তুলে দিয়ে তারপর গিরিডি রওনা হবে।'

মেয়ে পৌঁছবার এই বিচিত্র জটিল দায় এক কথায় স্বীকার করে নিতে একটুও আপত্তি করে না হিমু।

হিমুদা! হিমুদা! হিমুদা! শহরের পাঁচ মেয়ের কলকাতা রওনা হবার দিন স্টেশনে বিচিত্র কলরবে মুখর একটা দৃশ্যও দেখা দিল।—হিমুদা আমার ব্যাগটা কোথায়? হিমুদা আমার ছাতাটা কোথায়? এক প্যাকেট লজেন্স নিতে ভুলবেন না হিমুদা।

ডাকটা হিমুদা বটে, এবং একটা আপনত্বের ডাকও বটে; কিন্তু সত্যিই দাদা বলে কেউ কি হিমুকে সম্ভ্রম করছে? হিমুর গায়ে ঠেলা দিয়ে কথা বলতেও প্রমীলার হাতে একটুও বাধে না। পাঁচটি ছাত্রীর কলকাতা যাত্রার উল্লাসের মধ্যে একমনে অবাধ নিষ্ঠার সঙ্গে শুধু ফাই-ফরমাস খাটতে থাকে হিমু। কেউ কারও জিনিস-পত্রের দিকে ভুলেও একটা পাহারার দৃষ্টি তুলে তাকায় না। এমনকি বাপ-মা কাকা মামা যাঁরা স্টেশনে এসেছেন, তাঁরাও না। তাঁরা মেয়েদের কানের কাছে উপদেশ বর্ষণ করতেই ব্যস্ত।—পৌঁছেই চিঠি দিবি। সাবধান, শীতটা পড়লেই গরম জলে স্নান করতে যেন ভুল না হয়।

বাক্স গোনে হিমু। খাবারের ঝুড়িগুলিকে গুনে একদিকে সরিয়ে রাখে হিমু। সরযূর ওভারকোট আর কল্যাণীর মাফলার হিমু দত্তেরই হাতে ঝুলছে। অতসী তার হাতের ছোট ব্যাগটাকেও হিমু দত্তের হাতের দিকে এগিয়ে দেয়। ব্যাগ হাতে তুলে নেয় হিমু। অতসীও এইভাবে হাত খালি করে নিয়ে খোঁপাটাকে নাড়াচাড়া ক'রে একটু গুছিয়ে নেয়।

স্টেশনেই, এবং ট্রেন ছাড়বার আগেই পাঁচ মেয়ের দাবীর এই ব্যাপার! বাকি পথে তাহলে কি কাণ্ডই যে হবে অনুমান করতে পারেন বাপ-মা আর কাকা মামারা। ভাবতে গিয়ে হেসেও ফেলেন। আলোচনাও করেন, সত্যিই এরা হিমুকে

পেয়েছে কি? ভাল মানুষ বলে একেবারে ওকে দিয়ে পান পর্যন্ত সাজিয়ে নেবে?

হিমু দত্ত যে একটা পুরুষ মানুষ, হিমু দত্তের জীবনের এই সহজ ও সামান্য সত্যটুকুও কি ওরা মনে রাখতে পারে না? কোন হিমিদির প্রতি ওদের মনে যেটুকু সমীহ আর ভয় থাকে, তার দশভাগের এক ভাগও যদি হিমুদা নামে এই পুরুষ মানুষটার প্রতি থাকতো! কিন্তু হিমু দত্তের সম্পর্কে কারও চিন্তায় এরকম কোন প্রশ্নেরই বালাই যেন নেই।

হিমু দত্তের বয়সটাও যে পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি নয়, এই সত্যও যে এতগুলি মেয়ের মধ্যে কোন মেয়ে মনে রাখতে পারে না। প্রমীলার ওভারকোটের পকেটের মধ্যে একটা রুমাল রয়েছে, সেণ্ট মাখানো রুমাল। একটি মুহূর্তের মতও সাবধান হয়ে ভাবতে পারেনি প্রমীলা, ঐ রুমালের সৌরভ হিমু দত্তের নিঃশ্বাসের বাতাস স্পর্শ করতে পারে। সরযূ তার হাতের যে ছোট ব্যাগটা হিমু দত্তের হাতে তুলে দিয়েছে, সেই ব্যাগের গায়ের উপরেই খাঁজকাটা খাপের মধ্যে সরযূর মুখের ছোট একটা সুশ্রী ফটো বসান আছে। ভুলেও একবার ভেবে দেখতে পেরেছে কি সরযূ, হিমু দত্তের চোখের উপর ঐ ফটোর ছায়া হঠাৎ ঝিক করে ফুটে উঠতে পারে? কি মনে করে ওরা? হিমু দত্তও কি একটা মেয়ে? কিংবা, হিমু দত্ত একটা ব্যক্তি মাত্র, এবং ঐ ব্যক্তিত্বের কোন পৌরুষেয়তা নেই?

গিরিডি থেকে কলকাতা পর্যন্ত যেতে ট্রেনের সারাটা পথ হিমুদাকে দিয়ে ওরা কি সব কাণ্ড করিয়েছিল, সে গল্প আর তিন মাস পরেই বাড়ির সকলে শুনতে পেল; বড়দিনের ছুটিতে হিমুই আবার কলকাতায় গিয়ে ওদের যখন নিয়ে এল।

হিমুদা কমলালেবু ছুলে দিয়েছে, ওরা খেয়েছে। হিমুদা

চীনাবাদামের খোসা ভেঙ্গে দিয়েছে, ওরা খেয়েছে। কাণ্ডগুলি করতে ওদের একটুও বাধেনি এবং হিমুরও একটুও আপত্তি হয়নি।

—হিমুদা বেচারা সত্যিই মাটির মানুষ। কি ভয়ানক উপদ্রবই না আমরা করলাম, কিন্তু হিমুদা শুধু হেসে হেসেই সারা হয়ে গেল।

বড়দিনের ছুটিতে বাড়িতে এসে যে-ভাষায় যে-ভাবে হেসে হিমুদার নামে গল্প করে প্রমীলা, প্রায় সেই ভাষাতেই সে-ভাবে হেসে নিজের নিজের বাড়িতে গল্প করে সরযূ, অতসী, নিভা আর কল্যাণী।

এ হেন হোমিও হিমুই একদিন চমকে উঠলো, যে নামে তাকে কেউ ডাকে না, সেই নামেই একজন তাকে ডেকে ফেলেছে। হিমাদ্রিবাবু! কি আশ্চর্য, হোমিও হিমু নিজেই যে নিজেকে হিমাদ্রিবাবু বলে মনে করতে ভুলে গিয়েছিল। কল্পনাও করতে পারেনি যে, এরকম একটা সম্ভ্রম মিশিয়ে তার নামটাকে ডাকা যায়, এবং কেউ ডাকতে পারে। তা ছাড়া, হিমাদ্রিবাবু বলে ডাকলো যে, তার বয়সও যে হোমিও হিমুর বয়সটার তুলনায় খুব কম নয়। হোমিও হিমুর বয়স বড় জোর পঁচিশ-ছাব্বিশ। হিমাদ্রিবাবু বলে ডাকলো যে, তার বয়স বড় জোর একুশ-বাইশ। হিমুদা নয়; এমন কি হিমুবাবুও নয়, একেবারে হিমাদ্রিবাবু। একটু বেশি আশ্চর্য হবারই কথা। কারণ, গিরিডিতে এই এক বছরের জীবনে, সব মানুষের সঙ্গে এত মেলামেশা জানাজানি ও চেনাচেনির ইতিহাসে, নিজেকে যে-নামে কোনদিন শুনতে পায়নি হোমিও হিমু, সেই নাম ধরে ডেকে ফেললো যে, সে একটি মেয়ে। বেশ বড়লোকের মেয়ে; বেশ সুন্দরী মেয়ে। বেশ শিক্ষিতা মেয়েও বলতে পারা যায়, কারণ সে এখন কলেজে সাএন্স পড়ছে; সেকেণ্ড ইআরে পৌঁছেছে।

সেই মেয়ের বাবা একটা সমস্যায় পড়েছেন বলেই হোমিও

হিমুর জীবনে এই নতুন নামে ডাক শোনবার ঘটনাটা দেখা দিয়েছে, নইলে এরকম একটা ডাক বোধহয় জীবনে না-শোনাই থেকে যেত।

উশ্রী নদীর কিনারায় একটা ফাঁকা শালবনের কাছাকাছি সুশ্রী একটি বাড়ি। চারু ঘোষের বাড়ি—উদাসীন।

বেশ টাকা-পয়সা আছে উকীল চারু ঘোষের, এবং বাড়িটার চেহারাও বেশ রং-চঙে। বাড়িতে যখন তখন গ্রামোফোনের রেকর্ড বাজে, এবং বারান্দার উপর মক্কেলের ভিড়ও লেগে আছে। তাই একটু ভাবতে হয়, এমন বাড়ির নাম উদাসীন রাখা হলো কেন?

চারু ঘোষের জীবনটা মোটেই উদাসীন নয়। অত্যন্ত কর্মব্যস্ত ও চিন্তারত জীবন। চারু ঘোষের বাড়ির ছেলে-মেয়েদের চেহারাও উদাসীন নয়। সব সময়েই হাসছে আর খেলছে, বেশ দুরন্ত খুশির জীবন। তারপর, বড় মেয়ে যূথিকা ঘোষের জীবন। ঝকঝক করে চোখ, ঝিকঝিক করে মুখের হাসি আর ঝলমল করে সাজ, যূথিকা ঘোষের জীবনটাকে একটা উচ্ছল আশার জীবন বলেই মনে করতে হয়। উদাসীনতার সামান্য ছায়াও নেই যূথিকা ঘোষের মুখের ভাষায় ও চোখের চাহনিতে।

পৃথিবীতে কারও কাছ থেকে এক পয়সার উপকার নেব না, এবং কাউকে একটা পয়সার উপকার দেবও না। এরকম একটা আদর্শ বাস্তবতার সংসারে সত্যিই সম্ভব কিনা, এ প্রশ্ন আর যারই মনে যত গোলমাল বাধাক না কেন, চারু ঘোষের মনে কোন গোলমাল বাধাতে পারে না। এবিষয়ে চারু ঘোষের মনটা একেবারে পরিষ্কার। বিশ্বাস করেন চারু ঘোষ, এই রকম

জীবনই হলো আদর্শ জীবন। কারও উপকার নেব না, কারও উপকার করবো না। কারও অপকার করবো না, কারও কাছ থেকে অপকার নিতেও পারবো না। অর্থাৎ সরে থাকবো, যেন কেউ অপকার করবার সুযোগ না পায়। চারু ঘোষকে যারা ভালমত জানে, তারা বিশ্বাসও করে। হ্যাঁ, বাস্তবিক, চারু ঘোষ সত্যিই মানুষের উপকার-অপকারের নাগাল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে অদ্ভুত একটা দার্শনিক অস্তিত্ব সত্য করে তুলতে পেরেছেন।

চারু ঘোষের বাড়িতে কোন ক্রিয়া-কর্মে, কোন উৎসবে কারো নিমন্ত্রণ হয় না। চারু ঘোষও কোন বাড়ির নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যান না। ছেলে-মেয়েদের জন্মদিনে যে উৎসবটা হয়, সে উৎসব নিতান্ত একটা পারিবারিক উৎসব। চিঁড়ের পোলাও রান্না করা হয়, এবং বাড়িতেই দুধ ফাটিয়ে ছানা করে আমসন্দেশ তৈরি করেন যূথিকার মা। স্বয়ং চারু ঘোষ, দুই ছেলে বীরু নীরু, মেয়ে যূথিকা এবং যূথিকার মা; এই পাঁচটি মানুষ ছাড়া বাড়ির আর কোন মানুষ চিঁড়ের পোলাও ও আমসন্দেশের স্বাদ গ্রহণ করে না। নিয়মই নেই।

বাড়ির আর মানুষ বলতে শুধু ঠাকুর চাকর ঝি মালী আর ড্রাইভার। উদাসীনের উৎসবের দিনেও তারা তাই খায়, যা রোজই খেয়ে আসছে। ডাল ভাত আর একটা তরকারি। চিঁড়ের পোলাও আর আমসন্দেশ একেবারে স্ট্রিক্টলি শুধু উদাসীনের বাপ-মা আর ছেলে-মেয়েদের খাবার টেবিলে পরিবেশন করা হয়।

হ্যাঁ, পরের দাবীর দিকটাও দেখতে ভুল করেন না চারু ঘোষ। সেদিকে তাঁর চোখ অন্ধ নয়, বরং খুবই সজাগ। ড্রাইভারকে যদি একবার ডাকঘরে পাঠাতে হয়, তবে চারু ঘোষ তাঁর পাল্টা কর্তব্যও স্মরণ করেন। একটা এক্সট্রা কাজ করেছে ড্রাইভার, এটা ড্রাইভারের নিয়মিত কাজের মধ্যে পড়ে না। সুতরাং

সেদিন ড্রাইভারের এই সামান্য এক্সট্রা কাজের জন্য ড্রাইভারকে এক পেয়ালা চা ও একটা বিস্কুট খেতে দেন যূথিকার মা। চারু ঘোষ বলেন—পয়সা দিয়ে কাজ নেব; কারও উপকার চাই না। ঠকবো না, কাউকে ঠকাবোও না।

মালী মাসে একদিন বাড়ি যাবার ছুটি পায়। এদিকেও নজর আছে চারু ঘোষের, যেন সত্যিই ছুটিটা অস্বীকার না করে মালী। মাসে একটা দিন ছুটি দেওয়া হবে বলে যখন নিয়ম করা হয়েছে, তখন সে নিয়মের এক চুল এদিক-ওদিক করা চলবে না, ছুটির দিনে মালীকে বাড়ি যেতেই হবে। যদি না যায়, তবে কাজ করতে দেওয়া হবে না। এবং সারাটা দিন মালীটা উদাসীনের বাগানের এক কোণের সেই ছোট টিনের ঘরটার মধ্যে পড়ে থাকলেই বা কি? সেদিন উদাসীনের ভাত ডাল তরকারি খাবার অধিকার থাকে না মালীর। খায়ও না মালীটা। মালী নিজেই বাজার থেকে নিজের পয়সায় ছাতু কিনে এনে খায়।

যূথিকার মা পাটনা থেকে একটা চিঠি পেয়েছেন, তাইতেই সমস্যাটা দেখা দিয়েছে। যূথিকার পাটনা যাওয়া চাই। আর একটি দিনও দেরি করা চলে না। কিন্তু কে নিয়ে যাবে?

পাটনা থেকে চিঠি দিয়েছেন যূথিকার মামী; জানিয়েছেন, নরেন এখন পাটনায় আছে। আর তিন-চার দিন মাত্র থাকবে। তারপরেই বোম্বাই চলে যাবে নরেন। সুতরাং···বুঝতেই পারছো, এই চিঠি পাওয়া মাত্র যূথিকা যেন পাটনা চলে আসে। তা ছাড়া, যূথিকার কলেজ খুলতেই বা আর কটা দিন বাকি আছে? বোধহয় আর পাঁচ-সাত দিন হবে। পাটনা তো আসতেই হবে। না হয় পাঁচ-সাত দিন আগেই এল।

যূথিকাও এরকম একটা সংবাদ শুনতে পাবে বলে তৈরি ছিল না। পাটনার কলেজ খুলতে আর সাতটা দিন বাকি আছে।

যূথিকা জানে, আর ছ'দিন পরে ঠিক সময় মত মধুপুর থেকে বলাইবাবু চলে আসবেন, এবং যূথিকাকে পাটনা পৌঁছে দিয়ে আসবেন; প্রত্যেকবার কলেজ ছুটির সময় পাটনা থেকে যূথিকাকে নিয়ে আসেন, ছুটি ফুরিয়ে যাবার পর পাটনাতে পৌঁছে দিয়ে আসেন বলাইবাবু। চারুবাবুর মধুপুরের যত বাড়ির ভাড়া আদায়ের সরকার মশাই, সেই বলাইবাবু, যিনি চারুবাবুর বাবার বয়সী, এবং আগে চারুবাবুর বাবার অফিসেই চাকরি করতেন।

এবারও বলাইবাবু সময়মত আসবেন এবং তাঁরই সঙ্গে পাটনা চলে যাবে যূথিকা, এই ব্যবস্থার মধ্যে একটা ওলট-পালট ঘটাবার দরকার হবে, এমন সম্ভাবনা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। চারুবাবু না, যূথিকার মা না, যূথিকাও না। কিন্তু পাটনার মামীর চিঠিটা হঠাৎ চলে আসতেই ফাঁপরে পড়লেন সবাই। সরকার মশাই, অর্থাৎ বলাইবাবু তো এখন মধুপুরে নেই। তিনি ধর্ম-কর্ম করতে পুরী গিয়েছেন, এবং পুরী থেকে ফিরবেন ঠিক সেই দিনের আগের দিনটিতে, যেদিন যূথিকার কলেজ খোলবার কথা। বলাইবাবুর পুরীর ঠিকানাও জানা নেই যে, একটা টেলিগ্রাম করে বলাইবাবুকে অবিলম্বে চলে আসতে বলা যেতে পারে। কিন্তু জানা থাকলে আর টেলিগ্রাম করলেই বা কি? বলাইবাবুর আসতেও তো ছুটো দিন সময় লাগবে। তারপর যূথিকাকে নিয়ে পাটনায় পৌঁছতে আর একটা দিন লাগবে। ততদিনে নরেন আর পাটনায় থাকবে না। তাহলে···নরেন যদি যূথিকাকে চোখে না দেখেই চলে যায়, তবে কেমন করে জানতে পারা যাবে যে, যূথিকাকে বিয়ে করবার জন্য এতদিনে সত্যিই তৈরি হয়েছে নরেন? যূথিকার মামী জানেন, যূথিকা আজও নরেনের কাছ থেকে স্পষ্ট করে ও কথাটা শুনতে পায়নি।

নরেনের সঙ্গে যূথিকার বিয়ে হবে বলেই আশা করেন চারুবাবু,

যূথিকার মা এবং যূথিকার পাটনার মামী। কিন্তু বিয়ে না'ও হতে পারে, এমন আশঙ্কাও আছে। তিন বছর ধরে প্রত্যেক ছুটিতে বোম্বাই থেকে যখন পাটনাতে আসে নরেন, তখন গর্দানিবাগে যূথিকার মামার বাড়িতে নরেনের নিমন্ত্রণ হয়, এবং নরেন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসে যাকে দেখতে পাবে বলে আশা করে, সেই যূথিকাকে দেখতেও পায়। কোন সন্দেহ নেই, যূথিকাকে ভালবাসে নরেন। কিন্তু ভালবেসেও আর কতকাল অপেক্ষা করতে চায় নরেন?

করুক না অপেক্ষা, চারুবাবুর কোন আপত্তি নেই। যূথিকার এই তো সেকেণ্ড ইআর চলেছে। যূথিকা ছাত্রী ভাল। যতদিন নরেন অপেক্ষা করবে, ততদিন যূথিকার কলেজের পড়ার জীবনও চলতে থাকবে। সেটাও একরকমের ভালই বলতে হবে। বরং এই সময় বিয়ে হয়ে গেলেই যূথিকার পড়া বন্ধ হয়ে যাবার ভয় আছে। যূথিকাকে কি বোম্বাই নিয়ে না গিয়ে আরও কটা বছর পাটনা কলেজের ছাত্রী হয়ে থাকতে দিতে রাজি হবে নরেন?

ঠিক ওসব প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হলো, নরেন আবার অর্থাৎ নরেনের মনটা আবার যদি উদাস হয়ে যায়? সত্যিই মাঝে একবার উদাস হয়ে গিয়েছিল। বছরের মধ্যে বার তিনেক পাটনাতে আসে নরেন; যূথিকার সঙ্গে প্রত্যেকবারই দেখা হয়। এবং ওদের দু'জনের মেলামেশার আনন্দও বছরে তিনবার উৎসবের মত উতলা হয়ে ওঠে। এই দেখা-শোনা ও মেলামেশার মধ্যে যদি হঠাৎ কোন ছেদ পড়ে; যদি একবার, কিংবা পর পর কয়েক বার দুজনের মেলামেশার উৎসব বাদ পড়ে যায়, তবে যে নরেনের মনে অপেক্ষার আগ্রহও উদাসীন হয়ে যেতে পারে। এমন অনর্থ অনেক ভালবাসার জীবনে ঘটতে দেখা গিয়েছে। শুধু একটানা একবছরের অদেখাতেই ভালবাসা ভেঙ্গে গেল এবং কেউ কারও

খোঁজও নিল না, এমন ঘটনা চারুবাবু তাঁর নিজেরই শ্যালিকা সুমতির জীবনে দেখেছিলেন। তাই একটা ভয় আছে তাঁর মনে। যূথিকার মা এবং মামীর মনেও ভয় আছে। যেন হাতছাড়া না হয় নরেনের মত ছেলে। ভারত সরকারের টেক্সটাইল উন্নয়নের কাজে এক হাজার টাকা মাইনের একটা পদ এই ত্রিশ বছর বয়সেই দখল করেছে যে ছেলে, সেই ছেলে যূথিকার মত একটা সাএন্স পড়া সেকেণ্ড ইআরের মেয়েকে ভালবেসেছে; যূথিকার ভাগ্যের জোর আছে। যূথিকা দেখতে সুন্দর বটে, কিন্তু ওরকম সুন্দর মেয়ে কতই তো আছে।

যূথিকারও জানতে বাকি নেই, পাটনার মামী চিঠিতে কি লিখেছেন। নরেন এসেছে। যূথিকা ঘোষের পক্ষে মনের চঞ্চলতা নিরোধ করে রেখে উদাস হয়ে থাকা অসম্ভব। নরেন পাটনায় থাকবে, আর যূথিকাকে দেখতে পাবে না, নরেনের চোখের বেদনাকে যেন চোখে দেখতে পায় যূথিকা। ইস, মাত্র আর তিনটি দিন পাটনায় থাকবে নরেন। তার পরেই, পাটনার ছেলে হতাশ হয়ে তার বোম্বাই-এর কাজের জীবনে চলে যাবে। এসময় গিরিডিতে পড়ে থাকা যে যূথিকার জীবনের একটা ভয়ঙ্কর অপরাধ। ভুল করবে না নরেন, যদি অভিমানে ক্ষুব্ধ হয়ে যূথিকাকে বিশ্বাস-ঘাতিকা বলে সন্দেহ করে ফেলে।

একাই পাটনা চলে যেতে পারা যায় না কি? পারা যায়, কিন্তু চারুবাবুই যেতে দিতে রাজি হবেন না। তা ছাড়া, যূথিকাও মনে মনে স্বীকার করে, যূথিকার নিঃশ্বাসের আড়ালেও একটা ভয় আছে। একা যেতে আর সাহস হয় না। মনে পড়ে, সেবার বড়দিনের ছুটির সময় পাটনা থেকে একাই গিরিডি রওনা হয়েছিল যূথিকা। এবং ট্রেন বদল করবার জন্য গয়াতে নেমেই দেখতে পেয়েছিল চামড়ার বড় বাক্সটা নেই আর গলার হারটাও নেই।

মেয়ে কামরার ভিতরেই ছিল যূথিকা, এবং ভুলের মধ্যে এই যে, মাত্র পনর-বিশ মিনিট, বড় জোর আধ ঘণ্টা হবে, জানালার কাঠের উপর মাথা হেলিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে একটু ঘুমিয়েছিল। তাইতেই এই কাণ্ড! না, একা একা ট্রেনে যাওয়া-আসা করবার ইচ্ছাটাও আর সাহস পায় না।

আদালত থেকে বাড়ি ফিরে এসে চারুবাবু বললেন—নবল-কিশোরবাবু বললেন, হিমু নামে একটা লোক আছে, যার ওপর এরকম একটা কাজের দায় অনায়াসে ছেড়ে দেওয়া যায়। বেশ ডিপেণ্ডেবল্। আর, একটা ডাক দিলেই ছুটে চলে আসে।

বীরু আর নীরু এক সঙ্গে হেসে চেঁচিয়ে ওঠে—হোমিও হিমু, হোমিও হিমু।

চারুবাবু আশ্চর্য হন—তার মানে?

যূথিকাও হাসে—লোকটার পুরো নাম হিমাদ্রিশেখর দত্ত। লোকটা নাকি হোমিওপ্যাথি ডাক্তারী করে।

চারুবাবু—কই, এ শহরে এরকম কোন ডাক্তারের নাম তো কখনও শুনিনি।

যূথিকা—লোকটা সত্যিই ডাক্তারী করে না। মাস্টারী করে। গণেশবাবুর ছেলে-মেয়েদের পড়ায়।

চারুবাবু—লোকটাকে তুই চিনিস নাকি?

যূথিকা—দেখেছি। ওর নামে মজার মজার অনেক গল্পও শোনা যায়।

চারুবাবু—দেখে কি-রকম মনে হয়? ছ্যাঁচোর-ট্যাচোর নয় তো?

যূথিকা—না। তবে একটু ইডিয়টিক মনে হয়।

চারুবাবু—তা হলে মন্দ নয়। তাহলে লোকটাকে ডাকতে হয়।

যূথিকার মা ব্যস্ত হয়ে বলেন—ডাকতে হয় আবার কি? ডেকে ফেল। আর একটুও দেরি করা উচিত নয়।

ডাকতে দেরি হয়নি। হিমু দত্তকে ডেকে আনবার জন্য ব্যস্ত-ভাবে চলে গেল ড্রাইভার, এবং মাত্র আধঘণ্টা পরে ড্রাইভারের সঙ্গে ব্যস্তভাবে চলে এল হিমু দত্ত।

চারুবাবু বলেন—তুমি ড্রাইভারের কাছ থেকেই সব শুনেছ বোধহয় ?

হিমু—হ্যাঁ।

চারুবাবু—আজই, এই সন্ধ্যার ট্রেনেই রওনা হতে হবে।

হিমু—যে আজ্ঞে।

চারুবাবু—শুনেছি তুমি খুব ডিপেণ্ডেবল্ আর ডিউটি সম্বন্ধে খুব সজাগ।

হিমু বিনীতভাবে হাসে—আপনাদের সামান্য একটু উপকার করবো, এর জন্য মিছিমিছি কেন এত প্রশংসা করছেন ?

চমকে ওঠেন চারুবাবু—উপকার ? উপকার করতে বলছে কে তোমাকে ?

হিমু দত্তও অপ্রস্তুত হয়; আর চুপ ক'রে তাকিয়ে থাকে। চারুবাবু বলেন—আমার ধারণা, তোমার দৈনিক রোজগার ছ'টাকার বেশি হয় না। কি বল ?

হিমু বলে—তা বটে। মাসে ষাট টাকার মত হলে দিন দু'টাকাই তো দাঁড়ায়।

চারুবাবু—পাটনা যেতে আর ফিরে আসতে তোমার তিনটি দিন লাগবে।

হিমু—আজ্ঞে হ্যাঁ।

চারুবাবু—সুতরাং, তোমার তিন দিনের কাজের কামাই হিসাব করে ধরলে, তোমার রোজগারের ছ'টা টাকার ক্ষতি হয়।

হিমু হাসে—হিসেব করলে তাই হয়, কিন্তু সত্যিই ক্ষতি হয় না।

চারুবাবু—তার মানে ?

হিমু—ছেলে পড়াবার কাজে দু'তিন দিন কামাই করলে কেউ আমার মাইনে কাটে না !

চারুবাবু—ওসব কথা বলে আমাকে লাভ নেই। পরে কি করে বা না করে, সে-সব নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। আমার কথা হলো···

দেয়ালের ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে চারুবাবু বলেন—এই ছ'টাকা তুমি পাবে। তা ছাড়া, তোমার খোরাকী বাবদ দিন আরও দু'টাকা। অর্থাৎ ছ'টাকা ছ'টাকা বার টাকা।

হিমু বলে—না।

যুথিকার মা বলেন—বেশ তো, না হয় হয় আরও দুটো টাকা পাবে।

হিমু—না।

চারুবাবু তাঁর চশমার ফাঁক দিয়ে কঠোরভাবে হিমু দত্তের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন—আমার কাজের দরকারটাকে তুমি ব্ল্যাকমার্কেট মনে করলে না কি হে ?

এতক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে চারুবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলছিল হিমু। এইবার মুখ ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকায়। এবং তাকিয়েই দেখতে পায়, এই মুহূর্তে পাটনা রওনা হবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে যে মেয়ের জীবন, সেই মেয়েই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দরাদরির ভাষাগুলি শুনছে।

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে যুথিকা ঘোষ। হিমু দত্তের চতুর অবাধ্যতার উপর বিরক্তি আর ঘৃণার আক্রোশ যেন কোন মতে চেপে রেখেছে যুথিকা। লোকটা একটুও ইডিঅট নয়; মানুষের বিপদের উপর দর হেঁকে টাকা আদায়ের কায়দা খুব ভাল করেই রপ্ত করেছে লোকটা।

কিন্তু সত্যিই কি চলে যেতে চাইছে লোকটা? দরজার দিকে পা বাড়িয়ে দিয়েছে কেন?

যূথিকা ডাক দেয়—বাবা?

ডাকটা আর্তনাদের মত শোনায়। যূথিকা ঘোষের জীবনের আশার অভিসার ব্যর্থ ক'রে দেবার ক্ষমতা পেয়ে গিয়েছে হিমু দত্ত নামে চতুর পয়সালোভী এই লোকটা। ওকে এই মুহূর্তে সন্তুষ্ট না করতে পারলে, ওকে রাজি করাতে না পারলে, যূথিকা ঘোষের জীবনও যে আশার পথে এগিয়ে যেতে পারবে না।

যূথিকা ঘোষের ডাকের অর্থ বুঝতে দেরি করেন না চারুবাবু। হিমু দত্তের দিকে তাকিয়ে ডাক দেন।—শোন তবে।

ডাক শুনে মুখ ফেরায় হিমু। এবং শোনবার জন্যই প্রস্তুত হয়।

চারুবাবু বলেন—তোমাকে মোট ত্রিশটা টাকা পারিশ্রমিক দিচ্ছি।

হাঁপ ছেড়ে এবং নিশ্চিন্ত হয়ে হিমু দত্তের দিকে তাকান চারু-বাবু। এবং সেই মুহূর্তেই চমকে ওঠেন। কোন কথা না বলে আস্তে আস্তে হেঁটে দরজার দিকে চলে যাচ্ছে হিমু দত্ত।

চেঁচিয়ে ওঠেন চারুবাবু—এ কি? তুমি একটা কথাও না বলে ...এ কি রকমের অভদ্রতা!

হিমু দত্ত থমকে দাঁড়ায়; এবং শান্তভাবে হাসে—আমি টাকা নিই না স্যার।

চারুবাবু—তার মানে...এমনি শুধু...একটা বাতিকের জন্য...

হিমু—লোকের দরকারে আমি এমনিতেই একটু আধটু খেটে উপকার করি স্যার।

চারুবাবুর জীবনের একটা অহঙ্কারের স্তম্ভকেই যেন একটা ভয়ানক ঠাট্টার আঘাতে কাঁপিয়ে আর নাড়িয়ে দিয়েছে হিমু দত্ত।—ছটফট ক'রে বার-বার এদিক-ওদিক তাকাতে থাকেন চারুবাবু।

কোথা থেকে পৃথিবীর সব চেয়ে বাজে একটা লোক এসে চারু-বাবুর মত শুদ্ধ অহঙ্কারের গৌরবে গরীয়ান এক মানুষের একটা দরকারের সুযোগ পেয়ে যেন তাঁর চুল ধরে মাথাটাকে টেনে নীচু ক'রে দিচ্ছে। কারও উপকারের পরোয়া করেন না, কারও ধার ধারেন না যে মানুষ, সে মানুষকে আজ হিমু দত্তের মত একটা ইডিঅটের অহঙ্কারের বাতিকের কাছে হাত পেতে ঋণ চাইতে হবে ?

গলার ভিতর যেন ধুলো ঢুকেছে ; জোরে একবার কেশে নিয়ে এবং মাথাটাকে একটু হেঁট ক'রে বিড়বিড় করেন চারুবাবু।—বেশ, তবে তাই হোক, টাকা নিও না।

হোমিও হিমুর জীবনের একটা মূর্খ বাতিকের কাছে মাথা হেঁট করতে বাধ্য হয়েছেন চারুবাবু। কিন্তু চারুবাবুর এই আহ্বানের মধ্যে হৃদয়ের অভিনন্দন নেই। যেন একটা আক্রোশ অনিচ্ছাসত্ত্বেও, শুধু দায়ে পড়ে বাধ্য হয়ে হিমু দত্তের উপকার সহ্য করতে রাজি হয়েছে। মানুষকে অপমান করবার আগে অহঙ্কারের মানুষ নিজের পায়ের জুতোর দিকে তাকাতে গিয়ে ঠিক এইরকম মাথা হেঁট করে।

হিমু দত্ত বলে—যা-ই হোক, আমার আর কিছু বলবার নেই।

চারুবাবু—তাহলে তৈরি হও, এই সন্ধ্যার ট্রেনেই···

হিমু হাসে—না, আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

জীবনে এই প্রথম, অন্তত হিমু দত্তের গিরিডির জীবনে এই প্রথম স্পষ্ট স্বরে 'না' করতে পেরেছে হিমু, 'না' বলবার ইচ্ছে হিমুর। হিমু দত্তের জীবনের মূর্খ বাতিকটা হঠাৎ চালাক হয়ে গিয়েছে কিংবা হিমু দত্তের জীবনের গোবেচারা সম্মানটাই হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।

যুথিকা ঘোষের ছায়ার পাশ দিয়েই ব্যস্তভাবে হেঁটে চলে

গেল হিমু দত্ত। মস্ত বড় বারান্দা, তাড়াতাড়ি হেঁটে পার হতেও এক মিনিট লাগে। হন হন করে হেঁটে চলে যেতে থাকে হিমু, এবং ফুলের টবের সারি পার হয়ে সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াতেই পিছনের ডাক শুনে থমকে দাঁড়ায়।

—হিমাদ্রিবাবু! পিছন থেকে ডাক দিয়েছে যূথিকা ঘোষ। ডাকতে ডাকতে একেবারে কাছে চলে এসেছে।

হিমাদ্রিবাবু? ডাকটা যে একটা কপট স্তুতি। এই ডাকের পিছনে চারু ঘোষের মেয়ে যূথিকা ঘোষের জীবনের একটা দরকারের তাগিদ মুখ টিপে হাসছে। সত্যি তাই কি?

যূথিকা ঘোষের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বোঝা যায় না। বুঝতে পারে না হিমু। শুধু বোঝা যায়, হিমু দত্তের এই বিদ্রোহকে যেন কোন মতে শান্ত করবার জন্য যূথিকা ঘোষের উদ্বিগ্ন চোখের মধ্যে একটা চেষ্টা ছটফট করছে।

যূথিকা বলে—আপনি রাজি না হলে আমার আজ পাটনা রওনা হবার কোন উপায় নেই। আর, আজই রওনা না হতে পারলে ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যাবে হিমাদ্রিবাবু।

—বেশ তো। বেশ তো। ঠিক আছে, কিছু ভাববেন না। আপনি তৈরি হয়ে নিন।

বলতে বলতে, এবং বোধহয় মনের মধ্যে একটা নতুন বাতিকের তাড়নায় বিচলিত হয়ে, ফুলের টবের কাছে আস্তে আস্তে ঘুরে বেড়াতে থাকে হিমু দত্ত। যূথিকা ঘোষের মুখে করুণ অনুরোধ; একটা নকল করুণতা নিশ্চয়। কিন্তু তবু তো হিমাদ্রিবাবু বলে ডেকেছে। ইচ্ছে নেই, তবু তো সম্মান দেখিয়েছে।

যূথিকা ঘোষের তৈরি হতে পাঁচ মিনিট লাগে। ড্রাইভারের গাড়ি বের করতে এক মিনিট লাগে। এবং সন্ধ্যার ট্রেন ধরবার জন্য স্টেশনে পৌঁছে যেতে পাঁচ মিনিট।

জগদীশপুর পার হয়ে গেল ট্রেন। মাঝে মাঝে ফুলের নার্সারি আর রাঙামাটির মাঠের এদিকে-ওদিকে ছোট ছোট শালের কুঞ্জ। ট্রেনে বসে ফুলের নার্সারি আর শালকুঞ্জের দিকে চোখ পড়লেও যূথিকা ঘোষের মনের মধ্যে পাটনার ছবি ফুর-ফুর করে। ট্রেনটা ছুটতে ছুটতে দু'পাশের ফুলের নার্সারির বাতাসকে বুকের ভিতরে টানছে। গোলাপের গন্ধে মাঝে মাঝে ভরে যাচ্ছে ট্রেনের কামরা। কিন্তু যূথিকা ঘোষের কল্পনাকে নিকটের ঐ গোলাপের গন্ধ বোধহয় স্পর্শ করতে পারে না। হিমু দত্তের মুখের দিকে তাকায়নি যূথিকা ঘোষ, শালকুঞ্জগুলিকে দেখেও দেখতে পায়নি।

মধুপুরে পৌঁছতে ট্রেনটার বেশ দেরি হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে। পথের মাঝে হঠাৎ থেমে গিয়েছে ট্রেনটা। একজন যাত্রী নেমে গিয়ে খবর নিয়ে ফিরেও আসে, এক ভদ্রলোক অ্যালার্ম শিকল টেনেছেন। দুটো চোর তাঁর সুটকেস নিয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

—এই জন্যেই একা একা আর ট্রেনে ঘুরতে সাহস পাই না হিমাদ্রিবাবু।

এতক্ষণে এই প্রথম যূথিকা ঘোষ পাটনার ভাবনা ছেড়ে দিয়ে যেন কাছের জগতের একটা সমস্যার সঙ্গে আলাপ করলো। এতক্ষণ কামরার ভিতরে হিমু দত্ত নামে মানুষটা যূথিকার চোখের খুব কাছে বসে থাকলেও তাকে দেখতেই পায়নি যূথিকা, এবং কোন কথা বলবার দরকারও বোধ করেনি।

ট্রেন আবার চলতে শুরু করতেই যূথিকা বলে—আমি একাই পাটনা চলে যেতে পারতাম। কিন্তু শুধু ঐ একটি কারণে আপনাকে সঙ্গে নিতে হলো। চোরেরা মেয়েছেলেকে তো একটুও ভয় করে না। তাই, অন্তত, নামে-মাত্র একটা পুরুষ মানুষ সঙ্গে থাকলেও চোরের উপদ্রব থেকে একটু নিরাপদ থাকা যায়।

হিমাদ্রিবাবু নামে ডাক শুনে যে মেয়ের মুখের দিকে একবার খুবই আশ্চর্য হয়ে তাকিয়েছিল হিমু দত্ত, সেই মেয়েরই মুখের দিকে আর একবার আশ্চর্য হয়ে তাকায়। এটা প্রথম আশ্চর্য ভেঙ্গে যাবার আশ্চর্য। হিমাদ্রিবাবু কথাটার মধ্যে সম্ভ্রম আছে নিশ্চয়, কিন্তু যূথিকা ঘোষ যাকে হিমাদ্রিবাবু বলে ডেকেছে, তার মধ্যে কোন সম্ভ্রমের বস্তু দেখতে পেয়েছে কি? হিমু দত্তকেও কি শুধু নামে-মাত্র একটা পুরুষ বলে মনে করেছে যূথিকা ঘোষ?

বেশিক্ষণ নয়; কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র, আর বেশি সময় লাগেনি, এই প্রশ্নেরও একটি পরিষ্কার উত্তর পেয়ে যায় হিমু দত্ত।

যূথিকা তার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে।—তাই আপনাকে সঙ্গে নিতে হলো।

চারু-ঘোষের মেয়ের জীবনে একটা কাজের দরকারে, শুধু পাটনা পৌঁছে দেবার জন্য তার পিছনে একটা নামে-মাত্র পুরুষ হয়ে একটি বা দুটি দিনের জন্য একটা অস্তিত্ব রক্ষা করতে হবে যাকে, তাকেই হিমাদ্রিবাবু বলে ডেকেছে যূথিকা। কিন্তু এমন ডাক ডাকবার কি প্রয়োজন ছিল? নিভা আর সরযুদের মত হিমুদা বলে ডাকাই তো উচিত ছিল। না, হিমুদা ডাকটা যূথিকা ঘোষের মুখে ভাল শোনাবে না। হিমুর চেয়ে যে বয়সে এমন কিছু ছোট নয় যূথিকা, সেটা যূথিকার চেহারা আর হিমুর চেহারা দেখেই বুঝতে পারা যায়। প্রায় সমবয়সী কোন অনাত্মীয় পুরুষকে দাদা বলে ডাকতে কোন মেয়ের ইচ্ছে হয় না বোধহয়, এবং ডাকটা মুখেও বেধে যায়। কিন্তু নামে-মাত্র পুরুষকে একটা নামে-মাত্র দাদা বলে মনে করে ফেললেই তো হয়। তা যদি না পারে, তবে সোজা হিমু বলে ডেকে ফেললেই বা দোষ কি? একটা নামে-মাত্র পুরুষকে অনায়াসে শুধু নাম ধরে ডাকতে পারবে না কেন কোন মেয়ে? তা ছাড়া, যূথিকা ঘোষের

জীবন ও হিমু দত্তের জীবনের পার্থক্যটাও তো দেখতে হয়! কোথায় আভিজাত্যে সম্পদে শিক্ষায় কালচারে রুচিতে আর আকাঙ্ক্ষায় এত বড় হয়ে গড়ে ওঠা যূথিকা ঘোষ নামে এই মেয়ের জীবন, আর কোথায় হোমিও হিমুর জীবন, যে-জীবন বলতে গেলে কাঠের উপর লেখা একটা নাম মাত্র!

মস্ত বড় বাড়ি ঐ উদাসীনের মেয়ে অনায়াসে হিমু দত্তকে হিমু বলেই ডাকতে পারতো। ডাকলে অন্যায় বা অমানান কিছু হতো না। এবং তাহলে হিমু দত্তের মনটাও অকারণে কয়েক ঘণ্টা ধরে একটা মিথ্যা প্রশ্ন দিয়ে মনের ভিতরে কোন ভাবনার দ্বন্দ্ব বাধাতো না।

হিমু দত্ত কি ভাবছে, যূথিকার কথাগুলি হিমু দত্তের মনের ভিতরে গিয়ে কোন আঘাত দিল কি না দিল সেটুকু চিন্তা করবার কথাও যূথিকা ঘোষের মনে দেখা দিতে পারে না। হিমু দত্তের মুখের উপর কোন নতুন ছায়া পড়েছে কি না পড়েছে, সেটা হিমু দত্তের মুখের দিকে তাকালেও বুঝতে পারবে না যূথিকা। হিমু দত্তের মুখ তেমনই শান্ত, তেমনই একটি জড়-পদার্থ। বই-এর রঙীন ছবিকেও একটু নাড়া-চাড়া করলে ছবিটা যেন রং বদলায়। কিন্তু হিমু দত্তের ঐ নিরেট ও নির্বিকার মুখের উপর রং ছিটিয়ে দিলেও বোধহয় মুখটা রঙীন হয়ে উঠবে না।

এবং কালি ছিটিয়ে দিলেও বোধহয় কালো হয়ে যাবে না হিমু দত্তের শান্ত মুখ। হিমু দত্তের মনের ভিতর থেকে কয়েক ঘণ্টার ছোট একটা বিস্ময় হঠাৎ ভেঙ্গে গেল, বেশ হলো। কিন্তু সেজন্য হিমু দত্তের মুখের উপর কোন ভাঙ্গনের বেদনা কালো হয়ে ওঠে না।

ছোট হাত ব্যাগটাকে আস্তে আস্তে খোলে যূথিকা। ব্যাগের ভেতরে ছোট একটি আয়না। সেই আয়নার বুকে নিজেরই

মুখের ছবিকে প্রায় আধ-মিনিট ধরে অপলক চোখে দেখতে থাকে। হাত তুলে কপালের দু'পাশের চুলের ফুরফুরে দুটি ছোট স্তবক নেড়ে-চেড়ে একটু ভেঙ্গে দিয়ে এবং আরও ফুরফুরে ক'রে দিয়ে ব্যাগ বন্ধ করে যূথিকা। যূথিকার চোখের কাছে, সামনের বেঞ্চিতেই প্রায় মুখোমুখি বসে আছে যে নামেমাত্র একটা অস্তিত্ব, সেটা আছে বলেও যেন মনে করতে পারে না যূথিকা।

উঠে দাঁড়ায় যূথিকা। উপরে রাখা ছোট বাক্সটাকে খুলে একটা বই বের করে। ঝকঝকে ও রঙীন মলাটের একটি উপন্যাস। মধুপুর পৌঁছতে আর বেশি দেরি নেই। উপন্যাসের পাতার উপরে চোখ রেখে মনের সব আগ্রহ জমাট করে নিয়ে, চুপ করে বসে থাকে যূথিকা।

মধুপুর পৌঁছবার পর একটু বিরক্ত হয়ে এবং বাধ্য হয়ে হিমু দত্তের সঙ্গে যূথিকাকে কয়েকটা কথা বলতে হলো। কারণ ট্রেনটা মাত্র থেমেছে, সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো হিমু দত্ত—কুলি! কুলি।

গিরিডি টু মধুপুর, ট্রেন প্রায় ফাঁকা, নামবার যাত্রীর সংখ্যাও খুব কম। তা ছাড়া, প্ল্যাটফর্মের উপর গিজ গিজ করছে কুলি। লাগেজ নামাবার জন্য হুড়োহুড়ি ক'রে কুলিগুলো তো এখুনি ছুটে আসবে। অনর্থক অকারণ কুলি কুলি বলে চেঁচিয়ে একটা কাজ দেখাবার দরকার কি?

যূথিকা বলে—আঃ, কেন মিছিমিছি হাঁক ডাক করছেন? কোন দরকার নেই। আপনাকে এত ব্যস্ত হতে হবে না।

হিমু দত্ত একটু অপ্রস্তুত হয়ে, তার পরেই হঠাৎ একমুখ হাসি হেসে প্রশ্ন করে—আপনি বোধহয় হাঁকডাক চেঁচামিচি পছন্দ করেন না?

যূথিকা শুধু বলে—অবান্তর প্রশ্ন।

মধুপুরে ট্রেন থামবার পর বেশ কিছুক্ষণ ধরে কামরার ভিতরেই বসে থাকতে হয়, কারণ কুলিগুলো ছুটে আসে না। আসতে দেরি করছে। সেই ফাঁকে কিছুক্ষণের জন্য গণেশবাবুর স্ত্রীর কথা, সেই সঙ্গে গণেশবাবুর বাড়ির আরও অনেক কথা ভাবতে হয়। কারণ হিমু দত্তেরই ঐ গায়ে-পড়ে প্রশ্ন করবার রকম দেখে যূথিকার মনে পড়ে যায়, ঠিক এই রকমই গায়ে-পড়ে কথা বলবার আর প্রশ্ন করবার একটা বিশ্রী অভ্যাস আছে গণেশবাবুর স্ত্রীর, অর্থাৎ রমা মাসিমার।

উদাসীনের মেয়ে কারও উপকার নেয় না, নিতে চায় না। চারু-বাবুর জীবনের সেই দার্শনিক আদর্শটা তাঁর মেয়ের জীবনেও কম সত্য হয়ে ওঠেনি। গায়ে-পড়ে কারও সঙ্গে কথা বলে না যূথিকা; কেউ গায়ে-পড়ে কথা বলতে এলে বিরক্ত হয়। গণেশবাবুর স্ত্রী একদিন একরকম গায়ে পড়েই, অর্থাৎ নিজের ম্যালেরিয়ার গল্প বলতে বলতে হঠাৎ যূথিকাকে প্রশ্ন করেছিলেন—তোমার বয়স কত হলো যূথি?

এই প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে যূথিকা প্রশ্ন করেছিল—রোজ দশ গ্রেণ ক'রে কুইনিন খাবার পর কি হলো বলুন। সারলো কি আপনার ম্যালেরিয়া?

উদাসীনের কোন মানুষ ভুলেও গণেশবাবুর বাড়িতে যায় না। কিন্তু ওরা আসে উদাসীনে; গণেশবাবু, রমা মাসিমা ও লতিকা। এবং এসেই গায়ে-পড়ে যত গল্প আর প্রশ্ন ক'রে চলে যাওয়া ওদের একটা ধর্ম্ম যেন।

রমা মাসিমা'র উপর রাগ করতে করতে যূথিকা ঘোষের মনটা আর একজনের উপর রাগান্বিত হয়ে ওঠে। রমা মাসিমার মেয়ে

লতিকার উপর। সত্যিই, কেমন যেন ওরা। যেমন গণেশবাবু, তেমনি রমা মাসিমা, আর তেমনি লতিকা—ভাল মা আর মেয়ে।

গণেশবাবুর বাড়িটা উদাসীন থেকে বেশি দূরে নয়। উস্রী থেকে বেড়িয়ে উদাসীনে ফিরতে হলে পথের উপরেই পড়ে গণেশ-বাবুর বাড়ি। বাড়িটার ফটকের কাছে প্রকাণ্ড একটা কাঁঠাল গাছ। একটুও রুচি নেই বাড়িটার। শিউলি নয়, করবী নয়, হাস্নুহানা নয়—কাঁঠাল। তা ছাড়া বাড়িটাও যেন কাঁঠালের কড়া গন্ধে মাখানো। ঝাঁকে ঝাঁকে লোক আসছেই আর আসছেই, আর ভনভন ক'রে চলে যাচ্ছে। ফটকটা কখনও বন্ধ থাকে না। একটা গায়ে-পড়া বাড়ি; পথের লোককে যেন ঘরের ভিতরে ঢোকাতে পারলেই ধন্য হয়ে যায়।

বারান্দার উপর চেয়ার পেতে আর খবরের কাগজ হাতে নিয়ে সকাল দুপুর বিকেল সন্ধ্যা সব সময় বসে থাকেন গণেশবাবু। পথ দিয়ে কাউকে যেতে দেখলেই হাঁক দিয়ে একটা কথা না বলে ছাড়েন না।

—কোথায় চললে হে চিন্তাহরণ? ছেলের পরীক্ষার ফল কি হলো? পাশ করেছে?

—এই মালতী, তোর জেঠিমাকে আজ সন্ধ্যায় একবার আসতে বলবি তো। বলবি, কটক থেকে চিঠি এসেছে।

—কেয়া সর্দারজী, কাহাঁ চলেঁ? মামলা ডিসমিস হো গিয়া কেয়া?

—এই ঝুরিভাজা? খবরদার যদি এদিকে আবার এসেছ। কলেরা ছড়াবার জায়গা পাওনি?

—কত দাম পড়লো ক্ষিতীশবাবু? পেঁপেগুলি পরেশনাথের নাকি?

গণেশবাবুর এইসব প্রশ্ন তবু একরকম পদে আছে। তাঁর গায়ে-পড়া প্রশ্নগুলির মধ্যে কোন মতলব নেই। কিন্তু রমা

মাসিমার গায়ে-পড়া প্রশ্নগুলি যে ভয়ানক একটা মতলবের ব্যাপার ; একটা তদন্ত বলা যায়। নইলে যূথিকার বয়সের খোঁজ নেবার দরকার কি? লতিকার চেয়ে যূথিকার বয়স একটু বেশি কিনা, এই তো জানতে চান রমা মাসিমা। কেন জানতে চান, তা'ও জানে যূথিকা। এবং জানে বলেই মনটা মাঝে মাঝে বড় বিশ্রী অস্বস্তিতে ভরে ওঠে। তখন রাগ হয় আর একজনের উপর, যার চোখের সামনে দাঁড়াবার জন্য গিরিডি থেকে পাটনা ছুটে চলেছে যূথিকা। নরেনও যে লতিকাকে চেনে, এবং লতিকার সঙ্গে কয়েক-বার দেখা হয়েছে আলাপও হয়েছে নরেনের।

পাটনাতে থাকবার কোন দরকার হয় না লতিকার। কারণ পড়া ছেড়েই দিয়েছে লতিকা। তবু বছরের মধ্যে প্রায় ছ'মাস পাটনাতেই থাকে লতিকা। বছরে প্রায় আট-দশবার পাটনা থেকে গিরিডি আর গিরিডি থেকে পাটনা করছে। লতিকার বড়দা পাটনাতেই থাকে আর ডাক্তারী করে।

কোন দরকার নেই তবু বারবার গিরিডি থেকে পাটনা যাওয়া আর পাটনাতে থাকা যেন দরকার হয়েছে লতিকার জীবনে, সন্দেহ করতে আর বুঝতে কি কোন অসুবিধা আছে যূথিকার? একটুও না। যূথিকার মা বুঝেছেন, চারুবাবুও বুঝেছেন এবং পাটনার মামীও বুঝেছেন।

পাটনার মামীই অনেকবার স্পষ্ট করে যূথিকার মাকে লিখেছেন —কোন সন্দেহ নেই কুসুমদি, আপনাদের পড়শী গণেশবাবু আপনাদের শত্রু হয়ে উঠেছে। গণেশবাবুর স্ত্রীটি আরও সাংঘাতিক বলে মনে হচ্ছে। সে বস্তুটি নিজে পাটনাতে এসে গর্দানিবাগে নরেনের বাড়ি গিয়ে নরেনের সঙ্গে আলাপ করে এসেছে। লতিকার সঙ্গে নরেনের বিয়ে দেবার জন্য ওরা কি-ভয়ানক উঠে পড়ে লেগেছে, আপনি ধারণা করতে পারবেন না।

সাধ্যি কি লতিকার? সব খবর জেনেও মনে মনে হাসে যূথিকা। যেমন নরেনকে, তেমনি নরেনের মনের ইচ্ছাকেও চেনে যূথিকা! সেখানে ঘেঁষবার সাধ্যি কারও নেই। লতিকার ডাক্তার দাদা নরেনকে তোষামোদ করে যত নিমন্ত্রণই করুক না কেন, আর লতিকা যতই স্টাইল করে সেজে নরেনের চোখের সামনে এসে হেসে-হেসে কথা বলুক না কেন?

তবু একটা অস্বস্তি। লতিকা যে এখন পাটনাতেই আছে। নরেনও পাটনাতে আছে। ভাবতে গিয়ে যূথিকা ঘোষের মনের সঙ্গে শরীরটাও যেন ছটফট ক'রে ওঠে।

—অ্যাঁ, কি ব্যাপার? সামনের পৃথিবীটাকে এতক্ষণে চোখে পড়েছে, তাই প্রশ্ন করতে পেরেছে যূথিকা।

—কি বলছেন? প্রশ্ন করে হিমু।

—কুলি আসেনি এখনো?

—না।

—কেন?

—কুলিরা আজ ষ্ট্রাইক করেছে।

চমকে ওঠে যূথিকা—তাহলে, কি উপায় হবে?

—আজ্ঞে?

—জিনিসপত্র নামাবে কে, আর পাটনার গাড়িতে তুলে দেবেই বা কে? এ তো আচ্ছা বিপদ দেখছি।

স্টেশনের বাতাস একটা আগন্তুক ট্রেনের ইঞ্জিনের তীব্র চিৎকারের শব্দে চমকে ওঠে। যাত্রীর হুড়াহুড়ি শুরু হয়। পাটনা যাবার ট্রেন ইন করেছে।

চেঁচিয়ে ওঠে যূথিকা।—কি উপায় হবে হিমাদ্রিবাবু? এই ট্রেনে যদি উঠতে না পারি, তবে পাটনা গিয়ে আর লাভই বা কি।

যূথিকা ঘোষের হতাশার বেদনা ওর উদ্বিগ্ন চোখ দুটোকে বোধহয় এখনি জলে ভরিয়ে দেবে। বড় বেশি ছলছল করে চোখ দুটো।

বাঙ্কের উপর থেকে যূথিকার বেডিং আর বাক্সটাকে হিড়হিড় করে টেনে কাঁধের উপর তুলে নিয়ে হিমু দত্ত বলে—চলুন।

রাতও হয়েছে, ট্রেনে ভিড়ও খুব। ফার্স্ট ক্লাশের কামরাও যাত্রীর ভিড়ে ঠাসা।

ভিড় একটু কম, এমন কামরা খুঁজতে খুঁজতে সময়ও পার হয়ে গেল। গার্ডের আলোর সঙ্কেত জ্বলে উঠতেই তাড়াতাড়ি একটা ভিড়ে-ঠাসা কামরার ভিতরেই উঠবার চেষ্টা করতে হলো।

দুলে উঠেছে ট্রেন। জানালা দিয়ে বাক্স আর বেডিং কামরার ভিতরে ছুঁড়ে ফেলে দিল হিমু; যাত্রীর ধমক খেলো হিমু। দরজার হাতল ধরে কামরার ভিতরে পা এগিয়ে দিয়ে উঠে পড়লো যূথিকা। তারপর পিছন থেকে হিমু দত্ত। সঙ্গে সঙ্গে চমকে ওঠে যূথিকা ঘোষ—সর্বনাশ।

—কি হলো? শান্ত হিমু দত্তও যেন চমকে উঠে প্রশ্ন করে।

নিজের একটা পা-এর দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে যূথিকা ঘোষ—একটা স্যাণ্ডেল নীচে পড়ে গেল।

যূথিকা ঘোষের এক পায়ের এক পাটি স্যাণ্ডেলের দিকে তাকায় হিমু দত্ত। সোনালী জরির কাজ করা লাল মখমলের স্যাণ্ডেল। তার পরেই মুখ ফিরিয়ে প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকায় এবং সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে হিমু—ঐ যে!

তারপর হিমু দত্তকে আর দেখতে পায় না যূথিকা। বুক দুরদুর করে যূথিকার। লোকটা সত্যিই যে জুতোটাকে আনবার জন্য নেমে পড়েছে, আর ট্রেন যে এখন বেশ গড়গড়িয়ে চলতে শুরু করেছে।

কামরার ভিতরে বসবার জায়গা ছিল না। স্তব্ধ হয়ে, এক

ঠায় দাঁড়িয়ে ট্রেনের দোলানির সঙ্গে কাঁপতে থাকে যূথিকা। লোকটা সত্যিই আবার গাড়িতে উঠতে পারবে তো? জুতোটাকে কুড়িয়ে আনবার জন্য লোকটাকে কোন হুকুম, কোন অনুরোধ করেনি, এমন কি চোখের ইঙ্গিতেও কোন নির্দেশ দেয়নি যূথিকা। আশ্চর্য, একটু ভয়-ডরের বোধও নেই লোকটার। যূথিকার একটা খালি পায়ের দিকে তাকালো, তারপরেই একটা লাফ দিয়ে নীচে নেমে গেল।

যূথিকা ঘোষের আতঙ্কিত শরীরের কাঁপুনি, আর বুকের দুরুদুরু হঠাৎ থেমে যায়। কামরার দরজার বাইরে পা-দানির উপর একটা মূর্তি। আবার লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠতে পেরেছে লোকটা। দরজা ঠেলে কামরার ভিতরে ঢুকেই যূথিকা ঘোষের পা-এর কাছে জুতোটাকে ফেলে দিয়ে কামরার চারদিকে তাকায় হিমু দত্ত।

সত্যিই ন স্থানং তিলধারণং। হিমু চিন্তিতভাবে কামরার এদিকে আর সেদিকে তাকাতে থাকে। তাই দেখতে পায় না, চারু ঘোষের মেয়ে যূথিকা ঘোষ একটা হাঁপ ছেড়ে কি-রকম ক'রে হাসছে, আর হিমু দত্তকেই কি-একটা কথা বলতে চেষ্টা করছে।

ধন্যবাদ জানাবার চেষ্টা করছিল যূথিকা। কিন্তু লোকটা যে একবারও মুখের দিকে তাকাচ্ছেই না। ধন্যবাদ জানাবার সুযোগই পায় না যূথিকা, এবং আবার চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ট্রেনের দোলানির সঙ্গে দুলতে থাকে।

ফার্স্ট ক্লাসের কামরার ভিতরে জীবনে কোনদিন ঢোকেনি হিমু দত্ত। ফার্স্ট ক্লাসের মানুষগুলিকে দেখতেও বোধ হয় একটু ভয়-ভয় করে।

গাড়ির মধ্যে মহিলা ও শিশুর সংখ্যাই বেশি। সশিশু

মহিলারা টান হয়ে শুয়ে আছেন, ওদের কাছে গিয়ে কোন অনুরোধ করবার সাহস পায় না হিমু দত্ত। পুরুষেরা সবাই কামরার মেজের উপর রাখা বাক্স আর বেডিং-এর উপর বসে আছেন। এঁদের অনুরোধ করবার কোন অর্থ হয় না। শুধু ঐ ট্রাউজার পরা ভদ্রলোক যদি…

অনুরোধ করলে শুনবে কি? একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন, এই অবস্থাটা চোখে দেখিয়ে দিয়ে যদি ঐ ভদ্রলোককে একটু ছোট হয়ে বসতে অনুরোধ করা হয়, তবে ভদ্রলোক একটু ছোট হয়ে বসতে এবং একটু জায়গা ছেড়ে দিতে রাজি হবে কি? ভদ্রলোকের পরনে ট্রাউজার, তাই আরও হতাশ হয়ে যায় হিমু দত্ত।

দেখতে পায় যূথিকা, ট্রাউজার পরা ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে কি-যেন বলছে হিমু দত্ত। বুঝতে পারে যূথিকা, একটু আরাম করে বসবার জন্য জায়গা খুঁজছে হিমু দত্ত।

—নো নো, সঙ্গে সঙ্গে খেঁকিয়ে ওঠেন ট্রাউজার পরা ভদ্রলোক।

হিমু বলে—আমি না, আমার জন্য বলছি না।

যূথিকার দিকে চোখ পড়ে ভদ্রলোকের, এবং সেই মুহূর্তে ব্যস্ত হয়ে আধ-শোয়ানো শরীরটাকে গুটিয়ে আর পা নামিয়ে পাশে আধ-হাত পরিমাণের একটা জায়গা তৈরি করেন। তারপর সাগ্রহ স্বরে হিমুকে বলেন—আসতে বলুন ওঁকে। যথেষ্ট জায়গা আছে।

যূথিকাকে এগিয়ে আসবার জন্য, এবং ট্রাউজার পরা ভদ্রলোকের পাশে খালি জায়গাটিতে বসবার জন্য হাত তুলে ইঙ্গিত করে হিমু দত্ত। যূথিকা ঘোষ একটু আশ্চর্য হয়। তারপরেই ছোট্ট একটা ভ্রুকুটি করে যূথিকা মাথা নেড়ে আপত্তি জানিয়ে আবার সেই রকমই এক ঠায় দাঁড়িয়ে ট্রেনের দোলানির সঙ্গে দুলতে থাকে।

মাথা নেড়ে আপত্তি করতে গিয়ে যূথিকা ঘোষের মনের

ভিতরে অদ্ভুত রকমের একটা রাগের ঝাঁজও যেন তপ্ত হয়ে উঠেছে। ভুরু কুঁচকে চোখ দুটো ছোট ক'রে হিমু দত্তের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে আবার মুখ ফেরায় যূথিকা। মুখটাও লালচে হয়ে ওঠে।

ট্রাউজার পরা ভদ্রলোকের এই বেহায়া উদারতার রকম দেখে রাগ করেছে কি যূথিকা? কত ব্যস্ত হয়ে, যূথিকাকে পাশে বসাবার আশায় কত খুশি হয়ে সরে বসেছেন আর জায়গা ক'রে দিয়েছেন ভদ্রলোক। কিন্তু পরের উপকার নেওয়া পছন্দ করে না যে মেয়ে, তার পক্ষে রাগ হবারই কথা। কিন্তু, রাগ ক'রে হিমু দত্তের মুখের দিকে তাকায় কেন যূথিকা? চারু ঘোষের মেয়ের মনে এ আবার কোন্ রকমের ভুল? একজন অচেনা ভদ্রলোকের গা ঘেঁষে বসবার জন্য যূথিকা ঘোষকে ইশারা করেছে হিমু দত্ত; এমন ইশারা করতে পারলো হিমু দত্ত? একটুও বাধলো না? তাই কি রাগ করেছে যূথিকা?

যূথিকা ঘোষের ধারণা আর জল্পনাগুলিকে যেন ক্ষণে ক্ষণে চমকে দিয়ে যূথিকার মনে আরও অস্বস্তি ভরে দিচ্ছে হিমু দত্ত। ধারণা করেছিল যূথিকা, ট্রাউজার পরা ভদ্রলোকের পাশে নিজের জন্য জায়গা করেছে হিমু দত্ত। সে ধারণা মিথ্যে হয়ে গেল। ধারণা করেছিল যূথিকা, ট্রাউজার পরা ভদ্রলোকের পাশে ঐ জায়গাতে যূথিকা যখন বসলোই না, তখন হিমু দত্ত নিজেই বসে পড়বে, আর মনের সুখে হাঁপ ছাড়বে। যূথিকার এই ধারণাকেও মিথ্যে করে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল হিমু দত্ত।

কিন্তু কতক্ষণই বা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে হিমু দত্ত? হিমু দত্তের হাত-পা আর চোখ দুটো যেন একটুও সুস্থির হতে আর শান্ত হতে জানে না। কামরার এদিকে ওদিকে চোখ ঘুরিয়ে আবার কি-যেন দেখতে থাকে, এবং এক একজন নীরব

ও গম্ভীর ভদ্রলোকের কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে কত রকমের ভঙ্গীতে মিনতি ক'রে কি-যেন বলতে থাকে। বোধহয় হিমু দত্তের মিনতি ব্যর্থ হয়, সাড়া না পেয়ে আবার এগিয়ে এসে যূথিকা ঘোষের বাক্সটাকেই একটা টান দেয়।

যেন কামরার ভিতরে এই মানুষ ও মালপত্রের ভিড়টাকে একটু এলোমেলো ক'রে দিয়ে বাক্সটারই জন্য একটু জায়গা করতে চায় হিমু দত্ত। যাত্রী ভদ্রলোকেরা বিরক্ত হয়ে ভ্রুকুটি করেন; কেউ কেউ সতর্ক করেও দেন—একটু ভদ্রভাবে ধাক্কাধাক্কি করুন মশাই।

হিমু বলে—কিছ্ছু না, কাউকে একটু ছোঁবও না মশাই। শুধু এই বাক্সটাকে একটু সোজা করে রাখতে দিন।

বাক্সটাকে সোজা করে পেতে বেডিংটাকে তার পাশে কাত ক'রে দাঁড় করিয়ে দেয় হিমু দত্ত। এবং তার পরেই হেসে হেসে, যেন এতক্ষণের চেষ্টার একটা সাফল্যের গৌরবে ধন্য হয়ে যূথিকার দিকে তাকিয়ে বলে—এইবার বসুন।

—কি? ভ্রুকুটি করে যূথিকা।

—বসুন।

—আমার জন্য জায়গা করলেন নাকি?

—তবে কার জন্য?

আনমনার মত কি-যেন ভাবে যূথিকা; পরের কাছ থেকে এরকমের অদ্ভুত উপকার স্বীকার করে নিতে একটা লজ্জা আছে। তা ছাড়া, সত্যি কথা, যূথিকা ঘোষের মনটাও বিশ্বাস করতে পারে না, হিমু দত্তের এই চেষ্টাগুলি কি সত্যিই বিশুদ্ধ উপকার? এর পিছনে অন্য কোন ইচ্ছা নেই? হিমু দত্তকে প্রথমে দেখে যতটা বোকা-বোকা মনে হয়েছিল, এবং এখনও দেখে যতটা সরল মনের মানুষ বলে মনে হচ্ছে, ততটা বোকা-বোকা আর ততটা

সরল মনের মানুষ নয় বোধহয় হিমু দত্ত। ট্রাউজার-পরা ঐ ভদ্রলোকের মত স্পর্শলোভী না হলেও হিমু দত্তের মনটা একটু ছায়ালোভীও কি নয়? ধারণা করতে পারে যূথিকা, হিমু দত্তের অনুরোধ বিশ্বাস করে এই বাক্সের উপরে বসে পড়লে ভুল হবে। সন্দেহ হয়, হিমু দত্তও বাক্সের একদিকে একটুখানি জায়গা নিয়ে যূথিকা ঘোষের ছায়া ঘেঁষে বসে পড়বে। তখন কি আর হিমু দত্তের অভদ্রতাকে ধমকে শাসন করতে পারা যাবে? কিন্তু সহ্যই বা করা যাবে কি করে?

যূথিকা ঘোযের সতর্ক মন, হিসেবী মন, আর উদাসীনের আভিজাত্যে তৈরি কঠিন অহঙ্কেরে মনও যেন একটা চতুর কৌশল খুঁজে পায়। বাক্সটার সারা পিঠটা জুড়ে একেবারে পা ছড়িয়ে বসে, আর বেডিং-এর গায়ে হেলান দিয়ে এলিয়ে পড়ে যূথিকা। যূথিকার গায়ের ছায়া ঘেঁষে বসবার আর একটুও জায়গা নেই। জব্দ হোক হিমু দত্তের গোপন ইচ্ছাটা।

অনেকক্ষণ ধরে একমনে উপন্যাস পড়ে যূথিকা। কতক্ষণ পার হয়ে গেল, সেই হুঁসও বোধহয় নেই যূথিকার। কারণ সত্যিই তো উপন্যাস পড়ছে না যূথিকা। উপন্যাসের পাতার দিকে তাকিয়ে নিজেরই জীবনের এক আশার অভিসারের আনন্দ তৃপ্তি আর উল্লাসগুলিকে মনে মনে পড়ছে। এই রাত্রিটা পার হয়ে যাবার পর আর মাত্র পাঁচ-ছয় ঘণ্টা, কিংবা একটু বেশি, তার পরেই নরেনের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। স্টেশনে আসবে কি নরেন? মামী তো আসবেনই, কারণ বাবা নিশ্চয় একটা জরুরী টেলিগ্রাম ক'রে দিয়েছেন। কিন্তু মামী কি বুদ্ধি ক'রে নরেনকে একটা খবর না দিয়ে ছাড়বেন? কাল সকালেই পাটনা পৌঁছে যাবে যূথিকা, খবর নিয়ে টেলিগ্রামটা কি এখনো পাটনায় পৌঁছে যায়নি?

জব্দ হয়েছে হিমু দত্ত। হঠাৎ দু'চোখ তুলে একেবারে স্পষ্ট ক'রে দেখতে পায় যূথিকা, বাঙ্কের একটা শেকল ধরে এক ধারে দাঁড়িয়ে আছে হিমু দত্ত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছে; আর ঘুমন্ত মাথাটা বার বার ঝুঁকে বাঙ্কের ফ্রেমের উপর পড়ে ঠুক ক'রে বেজে উঠছে।

খোলা উপন্যাস, মিথ্যা উপন্যাসটাকে বন্ধ ক'রে হাতের ঘড়ির দিকে তাকায় যূথিকা ঘোষ। রাত মন্দ হয়নি। আর ঘুম-হারানো চোখ দুটোর মধ্যেও বিশ্রী রকমের একটা অস্বস্তি যেন ছটফট করছে।

হিমু দত্তকে একটা ধমক দিতে ইচ্ছে করে। কেন? ইচ্ছেটারই উপর যেন রাগ করে যূথিকা। লোকটার একটা ডিসেন্সি বোধও নেই? কি-রকম অভদ্রভাবে দাঁড়িয়ে ঘুমন্ত মাথাটাকে বাঙ্কের কাঠের উপর ঠুকছে। লোকটার শরীরে কি একটু অস্বস্তিরও বোধ নেই?

তবু ভাল; এই কামরার এতগুলি ভদ্রলোক আর মহিলা তবু বুঝতে পারবে যে, যূথিকা ঘোষের সঙ্গে একটা বাজে লোক শুধু সঙ্গী হয়ে চলেছে। কোন আপনজন নয়। কোন নিকট আত্মীয়তারও সম্পর্ক নেই। হিমু দত্ত যদি যূথিকা ঘোষের পাশে বসে পড়তো, তবে এই কামরার সব মানুষের চোখ কে-জানে কেমন করে তাকাতো, আর কি বুঝতো? ঐ যে শিখ মহিলা বার বার কেমন সন্দেহভরা চোখ নিয়ে একবার যূথিকার মুখের দিকে আর একবার হিমু দত্তের মুখের দিকে তাকাচ্ছেন, উনিই বোধহয় কোন সন্দেহ না ক'রে একেবারে বিশ্বাস করে ফেলতেন যে, এক বাঙালী ছোকরা তার···ছিঃ, যা নয়, তাই বিশ্বাস করে ফেলতেন ঐ শিখ মহিলা।

ট্রেন থেমেছে। এটা জসিডি। বেশ কিছুক্ষণ ট্রেনটা থেমে থাকবে। মা বলে দিয়েছেন, রাত বেশি করিস না; জসিডি পৌঁছেই খাবার খেয়ে এক কাপ চা খেয়ে নিবি।

খাবারের বাক্সটাকে পাশেই দেখতে পায় যূথিকা, এবং হাত বাড়িয়ে খাবারের বাক্সটাকে কাছেও টেনে নেয়। কতগুলি লুচি আর সন্দেশ, এই তো খাবার। কিন্তু এতগুলি লুচি আর এতগুলি সন্দেশ কি জীবনে কোনদিন একসঙ্গে খেয়েছে যূথিকা? জিনিসগুলি নষ্ট হবে। অনর্থক, আদরের বেশি বাড়াবাড়ি ক'রে এত বেশি খাবার সঙ্গে দিয়েছেন মা। আশ্চর্য, মা যেন যূথিকাকে একটা ক্ষিদের রাক্ষুসী বলে মনে করেন!

না, পাটনা পৌঁছতে পৌঁছতে খাবারগুলি নিশ্চয় নষ্ট হবে না। মামীর ছেলে অরুণ আছে, মামীর মেয়ে ধীরা আছে; বাসি লুচি-সন্দেশ খুশি হয়ে খাওয়ার মানুষ মামীর বাড়ীতে আরও আছে।

খাবারের বাক্সের ভিতর থেকে অয়েল পেপারের একটা ছোট করো বের করে নিয়ে তার উপর গুনে গুনে চারটে সন্দেশ আর চারটে লুচি রাখে যূথিকা। খাবারের বাক্স বন্ধ করে আবার পাশে রেখে দেয়।

ক্ষিদেও পেয়েছে বেশ। একটা সন্দেশ মুখের ভিতর ফেলতেই চমকে ওঠে যূথিকা।

—চা চাই নিশ্চয়? চেঁচিয়ে উঠেছে হিমু দত্ত।

যূথিকা ঘোষের খাওয়ার আনন্দটাকেও যেন চমকে দিয়ে, যূথিকার মনের ভিতর আবার কতগুলি বিরক্তি আর অস্বস্তি ভরে দিল হিমু দত্ত। চা চাই নিশ্চয়, কিন্তু এত চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করবার কি আছে?

কথা বলবার জন্য মুখ তুলেই দেখতে পায় যূথিকা, হিমু দত্ত নেই, প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়েছে, এবং শোনাও যায়, চেঁচিয়ে হাঁক দিচ্ছে হিমু দত্ত—এই চা-ওয়ালা ইধার আও।

চা-এর পেয়ালা নিজেই হাতে নিয়ে দরজা ঠেলে কামরার

ভিতরে ঢুকলো হিমু দত্ত, এবং যূথিকা ঘোষের হাতের কাছে চা-এর পেয়ালা এগিয়ে দিল।

কোন কথা না বলে, আর হিমু দত্তের মুখের দিকেও না তাকিয়ে চা-এর পেয়ালা হাতে তুলে নেয় যূথিকা ঘোষ। চা-এর পেয়ালায় চুমুক দেয়, এবং তারপরেই কেমন যেন সন্দেহ হয়। হ্যাঁ, চোখ তুলতেই খোলা দরজা দিয়ে দেখতে পায় যূথিকা, দরজার কাছেই প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে আছে হিমু দত্ত, আর, এক হাতে একটা শাল পাতার ঠোঙ্গা ধরে পুরি-তরকারি খাচ্ছে।

তিন চুমুকে চা শেষ ক'রে দিয়ে পেয়ালাটাকে পাশে রেখে দেয় যূথিকা, অয়েল পেপারের উপর এখনও চারটে লুচি আর তিনটা সন্দেশ পড়ে আছে, কিন্তু খাওয়া আর হলো না। যূথিকা ঘোষের হাতটা যেন রাগ ক'রে একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে খাবার সুদ্ধ অয়েল পেপারের টুকরোটাকে দলা পাকিয়ে একটা আবর্জনার মত একপাশে ফেলে রেখে দেয়। তার পরেই উপন্যাসের পাতা খুলে মনে মনে বুঝতে চেষ্টা করে, অনেক রাত হয়েছে, খাবার না খাওয়াই ভাল ; কিন্তু মিছিমিছি কিসের জন্য আর কার ওপর এত রাগ হলো ?

চা-ওয়ালা আসে। পেয়ালা তুলে নিয়ে চলে যায়। চা-এর দামটা দিয়ে দেয় যূথিকা।

হিমু দত্ত আবার কামরার ভিতর ঢোকে। যূথিকা ঘোষ প্রশ্ন করে—আপনার পুরি-তরকারির দাম কত ? ক' আনা দিতে হয়েছে ?

হিমু বলে—ছ' আনা।

ছ'আনা পয়সা হিমুর হাতের দিকে এগিয়ে দেয় যূথিকা ঘোষ। হাত এগিয়ে দিয়ে হিমু দত্তও বেশ আগ্রহের সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে ছ'-আনা পয়সা নিয়ে পকেটের ভিতর রাখে।

যূথিকা বলে—পয়সা গুনে নিন।

পকেট থেকে পয়সা বের করে আর গুনে নিয়ে হিমু বলে—ঠিক আছে।

সামান্য কয়েকটা কথা, এবং খুব অল্প কয়েকটা কথা কিন্তু এটুকু কথা বলতেই যেন হাঁপিয়ে পড়েছে যূথিকা ঘোষ, আর চোখ দুটোও জ্বলছে। এখন মনে হয়, এত অস্বস্তি ভোগ ক'রে পাটনা যাবার কোন দরকারই ছিল না। না হয়, নরেন রাগ করে বোম্বাই চলে যেত। কিন্তু হিমু দত্ত নামে এধরনের অদ্ভুত লোকের সঙ্গে একটা ঘণ্টা এক জায়গায় বসে থাকাও যে একটা শাস্তি। বড় নীচ মনের লোক। এর কাছে কোন সৌজন্য আর কোন লজ্জা আশা করা বৃথা। লোকটা একটা প্রশ্ন করতেও জানে না। লোকটা যে যূথিকা ঘোষকেই নামে-মাত্র একটা মেয়ে বলে মনে করেছে।

জসিডিতেই যাত্রীদের অনেকে নেমে গিয়েছে। একদিকের সীট একেবারে খালি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বুঝতে পারেনি যূথিকা, এরই মধ্যে কখন বেডিংটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে লম্বা সীটের উপর পেতে ফেলেছে হিমু দত্ত।

হিমু হাসে—আঃ, এবার আর কোন অসুবিধা নেই। অনেক জায়গা। আপনি এবার টান হয়ে শুয়ে পড়ুন।

কি বিশ্রী ভাষা! যূথিকা ঘোষের মত বয়সের মেয়েকে অনায়াসে টান হয়ে শুয়ে পড়তে বলে, বলতে মুখে একটু সঙ্কোচও নেই; হিমু দত্তের ভাষা সহ্য করতে আর ইচ্ছা হয় না।

কিন্তু খোলা বেডিং-এর দিকে এগিয়ে না যেয়েও পারে না যূথিকা। সত্যিই যে টান হয়ে শুয়ে পড়তে ইচ্ছা করছে। এতক্ষণ কামরার ভিতরে ভিড়ের চাপের মধ্যে বাক্সটার উপর বসে ধুঁকতে ধুঁকতে শরীরে ব্যথাও ধরে গিয়েছে।

যূথিকা বলে—আমার ব্যাপার নিয়ে বেশি ব্যস্ত হবেন না। আপনি এবার একটু নিজের সুবিধা ক'রে নিন।

হিমু বলে—আমার ব্যাপার নিয়ে আপনি মিথ্যে ব্যস্ত হবেন না। আমার সুবিধা তো আমি ক'রে নিচ্ছিই।

বাস্তবিক, লোকটা একেবারে নিরেট। একটা ভাল কথারও সম্মান দিতে জানে না।

হিমু দত্তের কথা শুনলে রাগ হয়, এটাও যে যূথিকা ঘোষের মনের একটা দুর্বলতা। হিমুর মুখের একটা কথার অর্থ নিয়ে এত চিন্তা করাই ভুল। হিমুর কথার মধ্যে এক ফোঁটাও ঘষা-মাজা ভদ্রতা থাকবে, এটা আশা করাও ভুল। হিমুর চোখের সামনে টান হয়ে শুয়ে পড়লেই বা কি আসে যায়? যূথিকা ঘোষ রাগ করে ওর নিজেরই মনের রাগটার উপর।

কিন্তু হিমু দত্ত বসবে কোথায়? লোকটা কি এখনও দাঁড়িয়ে থাকবে বলে মনে করেছে? সন্দেহ হয় যূথিকার, আর বোধহয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ট্রেনের দোলানির সঙ্গে দুলতে দুলতে বাঙ্কের কাঠের উপর ঘুমন্ত মাথাটাকে ঠুকে ঠুকে কষ্ট পাওয়ার ইচ্ছা নেই হিমু দত্তের; হিমু দত্তও ক্লান্ত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। তাই বাধ্য হয়ে সন্দেহ করতে হয়, এই সীটেরই একদিকে বসে পড়বে না তো হিমু দত্ত?

কী বিপদ! বিছানার উপর টান হয়ে শুয়ে পড়তে গিয়েও চুপ করে বসে থাকে যূথিকা। হিমু দত্তের কাণ্ডজ্ঞানের উপর ভরসা করা যায় না। হয়তো যূথিকা ঘোষের পা-এর কাছেই বসে পড়বে। মাথার কাছে বসে পড়লেই বা কি? অস্বস্তির জ্বালায় যূথিকা ঘোষের শরীরটা জ্বলবে, আর ঘুমের দফা রফা হয়ে যাবে।

যূথিকা ঘোষের মন যেন শক্ত হয়ে এই সন্দেহগুলিকে একেবারে তুচ্ছ ক'রে আর মিথ্যে ক'রে দিতে চায়। বসুক না হিমু দত্ত, মাথার কাছে কিংবা পা-এর কাছে; চোরা চাউনি তুলে কিংবা হাঁ ক'রে যূথিকা ঘোষের ঘুমন্ত চেহারাটার দিকে যত খুশি

তাকিয়ে যা ইচ্ছা হয় ভাবুক না কেন লোকটা। রাত জেগে কাহিল হতে পারবে না যূথিকা। শুয়ে পড়তেই হবে। হিমু দত্ত এমন মানুষ নয় যে, ওর চোখের দু-একটা চোরা চাহনিকে ভয় করতে হবে। টান হয়ে শুয়ে পড়ে যূথিকা ঘোষ। হাত তুলে চোখ দুটোকে ঢাকে, যেন উপরের কড়া আলোটার ঝলক চোখে না লাগে।

এইবার যেন মনে-প্রাণে একটা ঘুম প্রার্থনা করে যূথিকা। রাতটা স্বপ্নের মধ্যে দুলতে দুলতে পার হয়ে যাক।

নরেনের সঙ্গে লতিকার কি সত্যিই দেখা হয়েছে এবার? অসম্ভব নয়। লতিকা কি নরেনকে কোনদিন চিঠি লিখেছে? অসম্ভব নয়। নরেন কি লতিকার চিঠির কোন উত্তর দিয়েছে? অসম্ভব! কিন্তু উত্তর দিলেই বা কি? লতিকাকে কি লিখতে পারে নরেন, সেটা কল্পনা করতে পারে যূথিকা। এবং নরেনের চিঠির সেই ভাষা আর সেই কথা পড়ে লতিকা ঘোষের মনে আর যে-কোন ভাবনা দেখা দিক না কেন, কোন আশা দেখা দেবে না।

শেষ যে-দিন নরেনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল যূথিকার, কি কথা বলেছিল নরেন? হাতের ছায়ায় ঢাকা-পড়া যূথিকা ঘোষের চোখ-বোঁজা মুখটাই হেসে ওঠে।—আর বড় জোর একটা বছর দেখবো যূথিকা, দেখি কলকাতায় বদলি হতে পারি কিনা। যদি দেখি যে, কলকাতায় বদলি হবার কোন আশা নেই, তবে অগত্যা তোমাকে বোম্বাই প্রবাসিনী হতে হবে যূথিকা।

প্রশ্ন করেছিল যূথিকা—লতিকার ডাক্তার দাদা তোমাদের বাড়ি গিয়ে কিসের গল্প করে এলেন?

কোন উত্তর না দিয়ে শুধু একটু মৃদু হেসে যূথিকা

ঘোষের প্রশ্নের সূক্ষ্ম সন্দেহটাকে একেবারে মিথ্যে ক'রে দিয়েছিল নরেন। সেদিনের পাটনার যত আশ্বাস, যত হাসি, যত আলো আর শব্দগুলি যেন এখানেই এসে রিমঝিম ক'রে বেজে বেজে যূথিকার মনটাকেই ঘুম পাড়াতে থাকে।

একটা ছোট স্টেশনে, কে জানে কেন, হঠাৎ থেমে গেল ট্রেনটা, এবং থামতে গিয়ে জোরে একটা ঝাঁকানি খেয়ে যাত্রীদের ক্লান্ত শরীরগুলিকে চমকেও দিলো। ঘুম ভেঙে যায় যূথিকার; ভয় পেয়ে ধড়ফড় করে উঠে বসে। চোখ দুটো চমকে ওঠে।—অ্যাঁ? একি? কোথায় গেলেন আপনি?

কিন্তু কই হিমু দত্ত? যূথিকা ঘোষের পা-এর কাছেও না, মাথার কাছেও না। দেখতে পায় যূথিকা, কামরার দরজার পাশে সেই কোণটি ঘেঁষে, কাত হয়ে দাঁড়িয়ে, কামরার কাঠের দেয়ালে হেলান দিয়ে অঘোর ঘুমের সুখে মজে আছে হিমু দত্ত।

এমন লোককে সঙ্গে রাখা আর না রাখা সমান। যদি কোন চোর জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে যূথিকার গলার হার ছিঁড়ে নিয়ে চলে যেত, তবে? হিমু দত্তের দায়িত্ববোধ তো এই, যূথিকা ঘোষকে অসহায় ক'রে কামরার একদিকে ফেলে রেখে দিয়ে, নিজে আর একদিকে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর ঘুমোচ্ছে।

কিন্তু এসব আবার কি কাণ্ড? উপরের আলোটাকে কালো কাগজে ঠোঙা দিয়ে ঢেকে দিল কে? যূথিকার গা-এর উপরের আলোয়ানটা মেলে দিল কে? তাহলে অনেকবার কাছে এসেছে, দেখেছে আর চলে গিয়েছে হিমু দত্ত। যূথিকার ঘুমের আরাম-টাকে বেশ ভাল ক'রে সাজিয়ে দিয়ে গিয়েছে। তবু···ইচ্ছে ক'রে, বোধ হয় জোর ক'রে দূরে সরে গিয়ে একটা জেদের ভান করছে। কিন্তু কি মনে ক'রে হিমু দত্ত, যূথিকা ঘোষ

একেবারে খাঁটি ভদ্রতার কায়দা অনুযায়ী ওকে কাছে বসে থাকতে অনুরোধ করবে? এবং সে অনুরোধ না করলেই একেবারে ওদিকে গিয়ে, যেন কোন সম্পর্কই নেই এইরকম একটা পোজ নিয়ে, আর শুধু নিজেকে কষ্ট দিয়ে দিয়ে একটা কাণ্ড···হিমু দত্তের কাণ্ডগুলি সত্যিই অদ্ভুত। বেশ সূক্ষ্ম একটা একরোখা জেদ আছে মানুষটার।

চোখ মেলে তাকায় হিমু। ব্যস্তভাবে যূথিকার কাছে এগিয়ে আসে। আর, পকেট থেকে সোনার একটা হার বের ক'রে যূথিকার হাতের কাছে এগিয়ে দেয়—আপনার হারটা গলা থেকে খুলে পড়ে গিয়েছিল। আপনি ঘুমের ঘোরে টের পাননি।

খালি গলাটার উপর হাত বুলিয়ে, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আর হাত কাঁপিয়ে হারটাকে হিমুর হাত থেকে তুলে নিয়েই গম্ভীর হয়ে যায় যূথিকা।

ছোট একটা ধন্যবাদ জানিয়ে হিমু দত্তকে এইবার সরে যেতে বললেই তো হয়। কিন্তু ধন্যবাদের ভাষা যেন যূথিকার গলার ভিতরে আটকে গিয়েছে। তার কারণও মনের একটা অস্বস্তি, এবং যে অস্বস্তির মধ্যে একটা রাগের উত্তাপও আছে। ধন্যবাদ শুনতে চায় না, ধন্যবাদের জন্য কোন লোভই নেই, পুরস্কার দাবি করে না, শুধু উপকার করবার জন্য একটা বাতিকের ঘোরে লোকের উপকার করে, এহেন লোকের সঙ্গে কথা বলাও যে একটা সমস্যা। কি বলবে বুঝতে পারে না যূথিকা ঘোষ।

সত্যিই হারটা নিজের থেকেই গলা থেকে খুলে নীচে পড়ে গিয়েছিল তো? চারু ঘোষের মেয়ের মন মানুষকে সহজে বিশ্বাস করবার মত মনই নয়। বিনা স্বার্থে মানুষের উপকার করবার বাতিকটাও নিঃস্বার্থ বাতিক নয়। পৃথিবীর ভয়ানক

চালাকেরা ভয়ানক বোকা সেজে থাকে, এ সত্যও জানা আছে যূথিকা ঘোষের। উদাসীনের খুব বিশ্বস্ত একটা চাকর ছিল, রামটহল। মনে পড়ে, রামটহলের সেই অতিসূক্ষ্ম ভালমানুষী ছলনার ঘটনাটা। হঠাৎ একদিন একটা দশ টাকার নোট হাতে নিয়ে চারুবাবুর কাছে গিয়ে বলেছিল রামটহল—এটা কিসের কাগজ, দেখুন তো বাবা, আপনার দরকারী কোন কাগজ নয় তো?

চারুবাবু আশ্চর্য হলেন, এবং ছোঁ মেরে নোটটাকে রামটহলের হাত থেকে তুলে নিয়ে বললেন—না, না, এটা একটা বাজে কাগজ; কোথায় ছিল এটা?

রামটহল—খাটের নীচে ঝাড়ু দিতে গিয়ে পেয়েছি।

হিসাবে দশটা টাকার গরমিল কোনদিন হয়নি; কোনদিন দশ-টাকার একটা নোট হারিয়েছে বলে মনেও পড়েনা চারুবাবুর। তবু বুঝলেন, সত্যিই ভুল হয়েছিল নিশ্চয়; ভুলক্রমে দশ টাকার একটা নোট নিশ্চয় কদিন আগে পকেটের ভিতর থেকে পড়ে গিয়ে থাকবে। যাই হোক, কিন্তু চাকরটা কী চমৎকার বেকুব; একেবারে প্রস্তর যুগের বুনো মানুষের মত নিরেট একটা মূর্খ; দশ টাকার নোট পর্যন্ত চেনে না।

তার পর থেকে চারুবাবু আদালত থেকে ফিরে এসে রোজই গায়ের কালো কোটটা খুলে রামটহলের হাতে দিতেন। রামটহলই কোটটাকে আলনার হুকে টানিয়ে রাখতো। কোটের পকেটে তাড়া তাড়া নোট থাকতো; কিন্তু কোন আশঙ্কা নেই; নিশ্চিন্ত ছিলেন চারুবাবু। ঐ নোট রামটহলের কাছে অর্থহীন কতগুলি কাগজ মাত্র।

সেই রামটহল একদিন উধাও হয়ে গেল। এবং দেখা গেল, চারুবাবুর কালো কোটটা ঠিকই আছে; কিন্তু কোটের পকেটের ভিতর দু'হাজার টাকার নোটের দুটি বাণ্ডিল নেই।

যূথিকা ঘোষের গলার সোনার হার ফিরিয়ে দেওয়া রামটহলী

কৌশলের মত একটা মতলবের ব্যাপার নয় তো? ঘুমন্ত যূথিকার গলা থেকে হারটাকে নিজেই খুলে নিয়ে, তারপর এইভাবে ফিরিয়ে দিয়ে চমৎকার সাধুতার একটা কীর্তি দেখিয়ে...হিমু দত্তের এই বোকা-বোকা চোখের মধ্যে ভয়ানক চালাক কিছু লুকিয়ে নেই তো? যূথিকা ঘোষ বলে—কিন্তু ভাবতে আশ্চর্য লাগছে, হারটা খুলে পড়ে যাবে কেন?

হিমু বলে—জানি না কেন খুলে পড়ে গেল। তবে ঐ মহিলাকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখতে পারেন।

হিমু দত্ত সেই শিখ মহিলাকে দেখিয়ে দেয়।

যূথিকা বিরক্ত হয়ে বলে—ঐ মহিলাকে কি জিজ্ঞাসা করতে বলছেন?

হিমু—উনি দেখেছেন, আপনার গলার হারটা খুলে নীচে পড়ে গেল; উনিই আমাকে ডাক দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, হারটা নীচে পড়ে আছে।

কথা শেষ ক'রে এবং যূথিকা ঘোষের কোন কথা শোনবার আশায় না থেকে সরে যায় হিমু দত্ত। এবং সরে গিয়ে দরজার কাছে সেই কোণটিতে, সেই ভঙ্গীতে কাত হয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোবার জন্য চোখ বন্ধ করে।

অনেকক্ষণ নিথর হয়ে বিছানার উপর বসে থাকে যূথিকা। সোনার হারটাকে আবার গলায় পরানো হয়নি। হাতের মুঠোর মধ্যে কুঁকড়ে পড়ে আছে ঝকঝকে সোনার হার। হারটাকে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে, কিন্তু সাহস হয় না। মা'র কাছে অনেক মিথ্যে কথা বলে হার হারাবার অপরাধ ঢাকতে হবে, সেই ভয়ে বোধহয় যূথিকা ঘোষের হাতটা স্তব্ধ হয়ে থাকে; নইলে হিমু দত্তের মত একটা লোকের সততার ছোঁয়ায় একেবারে নির্লজ্জ হয়েছে যে হারটা, সেটার স্পর্শ এখন যূথিকা ঘোষের শুধু

হাতটাকে নয়, মনটাকেও কামড়াচ্ছে ; সে হার ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারলেই ভাল ছিল।

গিরিডি থেকে রওনা হবার পর কম সময় তো পার হয়ে গেল না। কিন্তু এই ন'ঘণ্টার মধ্যে একটা মিনিটও বোধহয় মনের আরাম নিয়ে জেগে থাকবার সৌভাগ্য হয়নি যূথিকার। বিরক্ত করেছে হিমু দত্ত। বারবার জব্দ করেছে হিমু দত্ত। ভয় পাইয়ে দিয়েছে হিমু দত্ত। বারবার লোকটাকে সন্দেহ করতে হয়েছে, আর সন্দেহ করেই ঠকতে হয়েছে। ইচ্ছে করেনি তবু ওর উপকার সহ্য করতে হয়েছে।

হিমু দত্তের মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিল যূথিকা ঘোষ, এবং নিজেরই বোধহয় হুঁস ছিল না যে, হিমু দত্ত হঠাৎ চোখ মেলে তাকিয়ে ফেলতে পারে, এবং দেখেও ফেলতে পারে যে, চারু ঘোষের মত মানুষের মেয়ে হিমু দত্তের মত মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

কিন্তু হিমু দত্তের চেহারাটাকে যে একটা ভয়ানক গর্বের চেহারা বলে মনে হয়। ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করবার ক্ষমতা সংসারের সব চেয়ে সাংঘাতিক নিন্দুকেরও নেই, বোধহয় এই গর্বেই মজে আছে হিমু দত্তের মন। এটাই বোধহয় ওর বাতিকের একমাত্র আনন্দ।

হিমু দত্তের এই গর্ব কি ভেঙ্গে দেওয়া যায় না? ওর কোন ভুল ধরে দেওয়া যায় না? যূথিকা ঘোষের মনের মধ্যে যে অস্বস্তি ছটফট করে, সেটা হলো একটা জেদ। হিমু দত্তকে জব্দ করবার জন্য একটা জেদ। হিমু দত্তের ব্যবহারের খুঁত ধরবার একটা প্রতিজ্ঞা।

ট্রেনটা থেমেছে। কে জানে কোন্ স্টেশন? হিমু দত্তের ঘুমন্ত চোখ সেই মুহূর্তে দপ ক'রে সতর্ক পাহারাদারের চোখের মত জেগে উঠে।

—শুনছেন। ডাক দেয় যূথিকা।

এগিয়ে আসে হিমু দত্ত।

যূথিকা বলে—আপনার তো সব দিকেই নজর আছে, খুব সাবধান আপনি। আমার কোন অসুবিধাই হতে দিচ্ছেন না। কিন্তু…

হিমু—বলুন।

যূথিকা—কিন্তু…

বলতে গিয়ে একটা শুকনো হাসি হেসে ফেলে যূথিকা,—কিন্তু আপনি জানেন না যে, আমার এখনও খাবারটুকু খাওয়ারও সুযোগ হয়নি।

—কেন? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে হিমু।

—আপনি দেখেননি, দেখতে পাননি, দেখতে ভুলে গিয়েছেন। যূথিকার অভিযোগের ভঙ্গীটাই হঠাৎ যেন রুষ্ট হয়ে ওঠে। হেসে হেসে ঠাট্টা করতে গিয়ে অদ্ভুত একটা আক্রোশ প্রকাশ ক'রে ফেলেছে যূথিকা।

হিমু বলে—দেখেছি।

যূথিকা আশ্চর্য হয়—কি?

হিমু—আমি দেখেছি, আপনি শুধু একটা সন্দেশ খেয়ে বাকি সব খাবার কাগজে মুড়ে ফেলে রেখে দিলেন।

—কি আশ্চর্য! চমকে ওঠে যূথিকা; তারপরেই একেবারে বোবা হয়ে হিমু দত্তের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

না, হিমু দত্তের ভুল হয় না। হিমু দত্তের চোখ ভয়ানক সাবধান ও সজাগ চোখ। হিমু দত্তের একটা ক্রটি ধরে অভিযোগ করবার আনন্দটুকুও যূথিকা ঘোষের কপালে জুটলো না। কিন্তু একটা প্রশ্ন তো করা যায়। বেশ রুক্ষস্বরে এবং প্রায় চেঁচিয়ে উঠে প্রশ্ন করে যূথিকা—চোখে দেখেও তো কিছু বললেন না।

হিমু দত্ত হাসে—বলা কি উচিত হতো?

—তার মানে? ভ্রূকুটি করে যূথিকা ঘোষ।

হিমু দত্ত আবার হাসে—বললে আপনি হয়তো ভাবতেন যে, আমি একটা অবান্তর কথা বলে মিছিমিছি আপনাকে…

—বুঝেছি। থাক, আর বলতে হবে না। যূথিকা ঘোষ আস্তে আস্তে, ক্লান্ত ও অলস স্বরে কথাগুলি বলেই মুখ ঘুরিয়ে নেয়, আর জানালার বাইরে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে রাতের অন্ধকার দেখতে থাকে।

বুঝতে আর অসুবিধা নেই, একেবারে মর্মে মর্মে এইবার বুঝতে পারা গিয়েছে, হিমু দত্তের মন জড়-পদার্থ ছাড়া আর কিছু নয়। যা বলা হয় তাই শোনে, যা শোনে তাই বোঝে, যা চোখে পড়ে তাই দেখে হিমু দত্ত। নিজের থেকে কিছু শোনবার বুঝবার আর দেখবার চেষ্টা ওর মনের মধ্যেই নেই। মধুপুর স্টেশনে সেই যে শাসানি দিয়ে অবান্তর কথা বলতে নিষেধ ক'রে দিয়েছিল যূথিকা, সে শাসানি স্মরণ করে রেখেছে হিমু দত্ত। কেমন যেন চাকর-চাকর মনের একটা লোক মাত্র। এহেন মানুষকে সন্দেহ ক'রে যূথিকা ঘোষ যে নিজেকেই ছোট ক'রে ফেলেছে। মনে মনে এই লজ্জা স্বীকার করে যূথিকা।

তবে ভাগ্যি ভাল, যূথিকা ঘোষের মনের এই লজ্জা পৃথিবীর কারও চোখে ধরা পড়ে যাবে না। সে ভয় নেই। এই হিমু দত্তও কল্পনা করতে পারে না যে, ওর মত মানুষকে জব্দ করবার জন্য চারু ঘোষের মেয়ের মনে একটা জেদ চেপে বসেছিল। যূথিকা ঘোষেরও এই লজ্জা ভুলে যেতে কতক্ষণ লাগবে? আর একবার টান হয়ে শুয়ে মনের সুখে একটা ঘুম দিয়ে ভোর করে দিতে পারলেই হলো।

লজ্জাই বা কিসের? একটা লোক পরের উপকার করবার

ব্যক্তিকে ভুগছে; সে লোকটার উপর রাগ হওয়াই তো উচিত। তাকে সন্দেহ করাই উচিত।

আকাশে তারা নেই। তবে কি ভোর হয়ে আসছে? অন্ধকারটা ফিকে হয়েছে? তাই তো!

পাটনা পৌঁছতে এখনও বেশ দেরি আছে। এখন ঘুমিয়ে পড়লেই ভাল।

কি গভীর ঘুম! আশা করেনি, ভাবতেও পারেনি যূথিকা; ট্রেনের কামরায় একটা সীটের উপরে এলোমেলো একটা বিছানার উপর শুয়ে আর এত দোলানির মধ্যে এত ভাল ঘুম হতে পারে। ভোর হয়ে গিয়েছে কখন, জানতে পারেনি যূথিকা। সূর্য উঠেছে, সকাল হয়েছে, কামরার জানালা দিয়ে ভিতরে রোদ ছড়িয়ে পড়েছে, আর প্রত্যেকটা স্টেশনে এত হাঁকডাক হয়েছে, কিছুই বুঝতে পারেনি যূথিকা। ঘুম ভাঙ্গলো তখন, যখন হিমু দত্তের ডাক কানের ভিতরে গিয়ে বেজে উঠলো।—শুনছেন, পাটনা এসে পড়েছে।

পাটনা? চমকে জেগে উঠেই প্রশ্ন করে যূথিকা।

হিমু দত্ত বলে—হ্যাঁ।

যূথিকা ঘোষ তাড়াতাড়ি হাত-ব্যাগ থেকে চিরুনি বের করে। হিমু দত্ত যূথিকা ঘোষের বিছানা গুটিয়ে বাঁধা-ছাঁদা করে।

ট্রেনের গতি মৃদু হয়ে এসেছে। জানালা দিয়ে মুখ বের করেই প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকায় যূথিকা। হেসে ওঠে যূথিকার চোখ। ট্রেনটা থেমে আসছে। কিন্তু এরই মধ্যে দেখে ফেলেছে যূথিকা, প্ল্যাটফর্মের ভিড়ের মধ্যে দু-তিনটে চেনা মুখও হাসছে। মামী এসেছেন, মামীর হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে অরুণ। যূথিকাকে দেখতে পেয়ে হাত দোলাচ্ছে অরুণ। আর, ফরফর ক'রে উড়ছে নরেনের গলার লাল-রঙা টাই। নরেনের মুখে হাসি, সেই

সঙ্গে নরেনের হাতের রুমালও সুস্মিত অভ্যর্থনার মত দুলে উঠেছে।

ট্রেন থেকে নেমে, প্রায় ছুটে গিয়ে মামীর কাছে দাঁড়ায় যূথিকা। অরুণের গাল টিপে আদর করে; এবং তার পরেই নরেনের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে।

একটা কুলি যূথিকা ঘোষের বাক্স আর বিছানা মাথায় তুলে নিয়ে হাঁক দেয়—চলিয়ে।

যূথিকা বলে—চল।

চলতে গিয়েই হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় যূথিকা।—ও হ্যাঁ···

মনে পড়েছে, হিমু দত্তকে গিরিডি ফেরবার খরচটা দিতে হবে। হাত-ব্যাগ থেকে টাকা বের ক'রে হিমুর দিকে তাকায় যূথিকা ঘোষ। এগিয়ে আসে হিমু। হিমুর হাতে টাকা ফেলে দিয়েই যূথিকা মামীর দিকে তাকায়।—চল এবার।

মামী বলেন—ছেলেটি ?···

যূথিকা বলে—ও এখন গিরিডি ফিরে যাবে।

মামী—কে ছেলেটি ?

যূথিকা ব্যস্তভাবে বলে—ও কেউ নয়; সঙ্গে এসেছে, এই মাত্র।

গর্দানিবাগের মাঠের কিনারায় পলাশের মাথা ফুলে ফুলে লাল হয়ে উঠলো যখন, তখন যূথিকা ঘোষের প্রাণটাও যেন গিরিডি ফিরে যাবার আশায় ফুলেল হয়ে ওঠে। কলেজের ছুটি হয়েছে, এবং এখন আর পাটনাতে পড়ে থাকবার দরকার নেই। কারণ, নরেন এখন আর ছুটি পাবে না, আর পাটনাতে আসতেই পারবে না। কাজেই, এখন গিরিডিতে চলে যাওয়াই ভাল।

লতিকা অনেকদিন আগেই গিরিডি চলে গিয়েছে। এবারের

পাটনা-জীবনের ঘটনাগুলির ইতিহাস মনে পড়লে মনে মনে হেসে ফেলে যূথিকা। নরেনকে নিমন্ত্রণ করে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে অন্তরঙ্গ হবার জন্য কতই না চেষ্টা করেছিলেন লতিকার দাদা ডাক্তার শীতাংশু। কিন্তু যূথিকার মামী লতিকার ঐ ডাক্তার দাদার চেয়ে অনেক চালাক। যে দুটো দিন পাটনাতে ছিল নরেন, সে দুটো দিন চারবেলা নরেনকে নিমন্ত্রণ করে রেখেছিলেন মামী। লতিকার ডাক্তার দাদার নিমন্ত্রণ স্বীকার করবার সুযোগই পায়নি নরেন।

কিন্তু নরেনের মনটা একটু উদার, এবং কোমলও বটে। যূথিকার কাছেই কথায় কথায় অভিযোগ করেছিল নরেন, মামী এরকম চারবেলা ধরে একটা জবরদস্ত নেমন্তন্ন না খাওয়ালেই ভাল করতেন। শীতাংশুদা বেচারা নিজে এসে বারবার কত অনুরোধ করলেন; ওঁদের বাড়িতে গিয়ে এককাপ চা খেয়ে এলেও কত খুশি হতেন শীতাংশুদা।

যূথিকা গম্ভীর হয়ে বলেছিল—লতিকাও নিশ্চয় খুশি হতো।

নরেন—তা, খুশি হতো নিশ্চয়।

যূথিকা—গেলেই পারতে।

নরেন হাসে—যেতে পারলে ভালই ছিল, কিন্তু পারলাম কোথায়?

সব ভাল নরেনের, শুধু ওর মনের এই দুর্বলতাটা ভাল লাগে না যূথিকার। লতিকার ডাক্তার দাদা শীতাংশুবাবুর জন্য নরেনের এত বেশি শ্রদ্ধার আবেগও যূথিকা ঘোষের ভাল লাগে না।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত জয়ি হয়েছিল মামীর চেষ্টা, এবং যূথিকার ইচ্ছা। যে দু টি দিন পাটনাতে ছিল নরেন, যূথিকার সঙ্গে চারবেলা দেখা হয়েছে। দু'দিন সন্ধ্যাবেলা দু'জনে বেড়িয়ে এসেছে। এবং দু'জনের মনের কথা দু'জনের কানের কাছে আবার নতুন

করে বলে বলে অনেক মুখরতা করছে দু'জনে। কোন সন্দেহ নেই যূথিকার, নরেনের মনও ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, শুধু এ ভাবে বছরে কয়েকবার চোখের দেখা দেখে, আর যূথিকাকে শুধু দু'দিনের বেড়াবার আর গল্পশোনার সঙ্গিনীরূপে কাছে পেয়ে তারপরেই বোম্বাই চলে যেতে ভাল লাগে না নরেনের। কিন্তু এখনও তৈরি হতে পারছে না নরেন, ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না, কলকাতায় বদলি হবার সুযোগ পাওয়ার আগেই যূথিকাকে বিয়ে করে হঠাৎ অত দূরে বোম্বাই-এ নিয়ে যাওয়া উচিত হবে কিনা।

যূথিকা বলে—বিয়েটা হয়ে যাক না ; বোম্বাই না হয় পরে যাব।

হেসে ফেলে নরেন—অপেক্ষা করতে কি তোমার ভয় হচ্ছে, কোন সন্দেহ হচ্ছে যূথিকা ?

—ছিঃ, কি যে বল ! বরং তোমার মুখে এরকমের প্রশ্ন শুনতেই আমার ভয় করে।

—তবে অপেক্ষা কর। মৃদু হাসি হেসে যূথিকাকে আশ্বাস দেয় নরেন।

কিন্তু এভাবে আশ্বস্ত হতে হতে যেন হাঁপিয়ে উঠেছে যূথিকার প্রাণ। মনের ভিতরে কোথায় যেন একটা কাঁটার খোঁচা খচখচ করে। ভালবেসেও শান্ত হয়ে শুধু অপেক্ষা করবার একটা ভয়ানক শক্তি যেন নরেনের আছে। লতিকাদের বাড়িতে যাবার জন্য, ডাক্তার শীতাংশুদার অনুরোধ রাখবার জন্য নরেনের মনের দুর্বলতাগুলিও যেন নরেনের একটা শক্তি। তাই যূথিকার মনটা যেন মাঝে মাঝে অবসন্ন হয়ে যায়। ভালবাসতে গিয়ে কি এভাবে কেউ হাঁপিয়ে পড়ে ? এত সাবধান হতে হয় কি ? বারবার এত দুর্ভাবনা নিয়ে গিরিডি থেকে ছুটে আসবার দরকার হয় কি ? হারাই হারাই সদা ভয় হয়, এই বুঝি ভালবাসার লক্ষণ।

নরেনের বোম্বাই রওনা হবার দিন স্টেশনে গিয়েছিল যূথিকা। মামীও গিয়েছিলেন। আর, কি আশ্চর্য লতিকার ডাক্তার দাদাও গিয়েছিলেন। লতিকা অবশ্য যায়নি, এবং কেন যাবার সাহস হয়নি লতিকার, সেটা অনুমান করতে পারে যূথিকা। যূথিকা আছে যে! একেবারে জলজ্যান্ত যূথিকার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে নরেনের সঙ্গে কথা বলবে লতিকা, এমন সাহসী প্রাণী নয় লতিকা। যাই হোক, ডাক্তার শীতাংশুদার এসেও কোন লাভ হয়নি। ট্রেন ছাড়বার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত নরেনের সঙ্গে অনর্গল কথা বললেন মামী; শীতাংশুদা নরেনের সঙ্গে একটা কথা বলবারও সুযোগ পেলেন না।

পাটনার এই জীবনের কয়েক মাস আগের এই ইতিহাসের এক একটি ঘটনায় যূথিকা ঘোষের আশা জয়ের গর্বে ভরে উঠেছে। শুধু একবার মনে হয়েছিল, এবং মনটা বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, নরেনের একটা চিঠির ভাষাতে একটু অবান্তর কৌতূহলের মায়া ছিল। লিখেছিল নরেন, লতিকা বোধহয় এখন পাটনাতে আছে। যূথিকাকে চিঠি লিখতে গিয়ে লতিকার কথা মনে পড়ে নরেনের, এটা যে নরেনের মনের পক্ষে একটুও উচিত নয়; সরল মনের নরেন এটুকুও বুঝতে পারে না?

গর্দানিবাগের পলাশের লাল দেখতে আর কি-এমন সুন্দর! মধুপুর পার হলেই দু'পাশের মাঠে পলাশের মাথাগুলি এখন যে রঙীন আগুনের স্তবকের মত ফুটে রয়েছে। যূথিকাকে গিরিডি নিয়ে যাবার জন্য কবে আসবেন বলাইবাবু?

মামী এসে বললেন—গিরিডি থেকে কুসুমদির চিঠি এসেছে। বলাইবাবু আসবেন না। লিখেছেন···

মামীর হাত থেকে চিঠিটা তুলে নিয়ে যূথিকা পড়ে।—ব্যবস্থা হয়েছে, হিমুই তোমাকে গিরিডি নিয়ে আসবে। পরেশবাবুর পিসিমাকে কাশী রেখে আসতে গিয়েছে হিমু; হিমুকে বলে

দেওয়া হয়েছে, টেলিগ্রাম করে তোমাকে আগেই জানিয়ে দেবে, কখন কোন্ ট্রেনে দানাপুর পৌঁছবে হিমু। মামী যেন তোমাকে বাড়ির গাড়িতে দানাপুর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

—হিমু কে? প্রশ্ন করেন মামী।

—হিমাদ্রিবাবু। হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে উত্তর দেয় যূথিকা। আর, মুখের উপরেও যেন মাঠের পলাশের লাল আভাটা ছুটে এসে লুটিয়ে পড়ে।

হিমাদ্রিবাবু কে? আবার প্রশ্ন করেন মামী।

—তুমি তো তাকে দেখেছো। ঐ যে, যে ভদ্রলোক এবার আমাকে গিরিডি থেকে নিয়ে এল।

—তাই বল। ছেলেটিকে দেখে বড় ভাল ছেলে বলে মনে হলো।

—ভাল বৈকি।

—ছেলেটি দেখতেও বেশ।

—তা, খারাপ কেন হবে?

—তেমন শিক্ষিত নয় বোধহয়?

—একটুও শিক্ষিত নয়। কিন্তু···

—অবস্থাও বোধহয় খারাপ।

—ঠিক জানি না, তবে গরীব মানুষ বলেই মনে হয়। কিন্তু তাতে কি আসে যায়?

মামী মুখ টিপে হাসেন—দূর পাগল মেয়ে; যার তার সম্বন্ধে ওভাবে কথা বলতে নেই।

পাটনা থেকে কতবার গিরিডি যেতে হয়েছে, কিন্তু যূথিকা ঘোষের মুখটা সে যাত্রার জন্য তৈরি হতে গিয়ে এরকম খুশিতে লালচে হয়ে উঠেছে কি কখনও? কোনদিনও না। এতদিন তো শুধু গিরিডি থেকে পাটনা ছুটে আসার পালাটাই জীবনের একটা ভাবনামধুর আর উদ্বেগসুন্দর পালা ছিল। কিন্তু গিরিডি

থেকে ফিরে যাওয়ার হয়রানিটাও যে কল্পনায় মিষ্টি হয়ে উঠেছে। বুঝতে পারছে কি যূথিকা ?

হিমুর টেলিগ্রাম এল, আজই রাত আটটা পঁয়ত্রিশের ট্রেনে দানাপুর পৌঁছবে হিমু, এবং যূথিকা ঘোষ যেন কলকাতার টিকেট কিনে সেই ট্রেনেই ওঠবার জন্য যথাসময়ে দানাপুরে উপস্থিত থাকে।

এখন দুপুর মাত্র; অনেক সময় আছে। কিন্তু যূথিকা ঘোষের ব্যস্ততা দেখে হেসে উঠলেন মামী—মামীর বাড়িতে কি খেতে পাচ্ছিলে না যূথি, গিরিডি যাবার নাম শুনেই লাফিয়ে উঠলে কেন ?

দানাপুরের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আগন্তুক আটটা পঁয়ত্রিশের ট্রেনটাকে দেখতে পেয়ে হেসে ওঠে যূথিকা ঘোষের মুখ। এবং ট্রেন থামবার পর, একটি কামরা থেকে হিমুকে নেমে আসতে দেখে সে হাসিটা আর একবার চমক দিয়ে যেন আরও সুন্দর হয়ে গেল।

ট্রেন ছাড়লো যখন, তখন কামরার একই সীটের উপর হিমুর পাশে ধপ করে বসে পড়ে যূথিকা ঘোষ, আর হাঁপ ছেড়ে বলে—আঃ, আমাকে গিরিডি নিয়ে যাবার জন্য আপনিই আবার আসবেন, আমি কোনদিন ধারনাও করতে পারিনি।

হিমু—হ্যাঁ, আমি কাশী যাচ্ছি শুনতে পেয়ে আপনার মা ডেকে পাঠালেন, আর···

যূথিকা—সব জানি, সব জানি। আজই মা'র চিঠি পেয়েছি।··· যাই হোক, আমাকে কিন্তু পরের স্টেশনেই চা খাওয়াতে হবে; সেই বিকালে এক কাপ চা খেয়েছিলাম, তারপর আর···আমার ব্যাগটা ওপর থেকে একবার নামিয়ে দিন তো হিমাদ্রিবাবু, প্লীজ···

আর দেখুন তো একবার··· সীটের নীচে একবার উঁকি দিয়ে দেখুন না, জলের কুঁজোটা উঠেছে, না দানাপুরেই পড়ে রইল ?

উঠে দাঁড়ায় হিমু, আর যূথিকা ঘোষের এতগুলি নির্দেশের ইঙ্গিতে খাটতে গিয়ে যেন তাল সামলাতে পারে না। বাঙ্কের উপরে তাকিয়ে হিমু বলে—না, জলের কুঁজো নেই। আর উবু হয়ে বসে মাথা নীচু করে সীটের নীচে তাকিয়ে বলে—কই, আপনার ব্যাগ এখানে নেই।

খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে যূথিকা—আপনারও এরকম ভুল হয় ? আপনি না খুব স্মার্ট কাজের মানুষ!

বিব্রতভাবে তাকায় হিমু—কি হলো ?

যূথিকা বলে—ব্যাগটা বাঙ্কের ওপরে, আর কুঁজোটা সীটের নীচে।

লজ্জিত হয় হিমু। আবার বাঙ্কের দিকে আর সীটের নীচে তাকিয়ে নিয়ে বলে—হ্যাঁ, ঠিক সবই আছে।

যূথিকা—তবে দিন।

হিমু—কি ?

যূথিকা—এক গেলাস জল।

কুঁজো থেকে গেলাসে জল ঢেলে যূথিকার হাতের কাছে এগিয়ে দেয় হিমু।

যূথিকা হাসে—আপনি খান। আপনার জন্যেই জল চেয়েছি।

হিমু একটু আশ্চর্য হয়ে তাকায়। যূথিকা বলে—আমি দেখেছি হিমাদ্রিবাবু, দানাপুর স্টেশনে আপনি জলের কলের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন···কিন্তু ট্রেন ছেড়ে দিল বলে জল না খেয়েই চলে এলেন।

জল খেয়ে নিয়ে হিমু বলে—ওঃ, এরকম কাণ্ড তো সারা জীবন ক'রে আসছি। ওসব গা-সহা হয়ে গিয়েছে।

যূথিকা ঘোষের চোখ, উদাসীনের কঠোর আভিজাত্যে তৈরি দু'টি চোখ অপলক হয়ে হিমু দত্তের মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। বোকা হিমু দত্তের মুখের ভাষাকে যে কবির ভাষার মত মনে হয়! তেষ্টা পায়, তেষ্টার জল দেখতে পায়, এবং ছুটেও যায় হিমু দত্ত। কিন্তু বেশি দূর এগিয়ে যাবার সৌভাগ্য হয় না। তেষ্টার বেদনা বুকে নিয়ে ছুটতে ছুটতে ফিরে যায়, নইলে ট্রেন ছেড়ে যাবে।

চারু ঘোষের মেয়ে তার নিজের মনটাকে বুঝতে চেষ্টা করে, এবং আশ্চর্যও হয়। হিমু দত্তের উপর আজ আর একটু রাগ করতে পারছে না কেন মনটা? যার উপকার সহ্য করতে করতে বিরক্ত হয়ে গিরিডি থেকে পাটনা পর্যন্ত সারাটা পথ বিশ্রীভাবে কেটেছিল, তারই কাছে আজ উপকার চাইতে ইচ্ছা করছে। হিমু দত্তকে খাটাতে ইচ্ছে করছে। এক গেলাস জল দিক, ব্যাগটা হাতে তুলে দিক। পরের স্টেশনে ট্রেন থামলেই যেন নিজে নেমে গিয়ে আর নিজের হাতে চা-এর কাপ এনে যূথিকার হাতের কাছে এগিয়ে দেয় হিমু।

বোধহয় প্রায়শ্চিত্ত করছে যূথিকা ঘোষের সেদিনের অকারণ ক্ষোভে রাগে আর সন্দেহে অভিভূত মনটা। ভদ্রলোক একটু বেশি ভালমানুষ হয়েই বোধহয় জীবনের সব চেয়ে বড় অপরাধ করেছে।

যূথিকা হঠাৎ বলে—আপনি তো সবারই উপকার করেন হিমাদ্রিবাবু।

হিমু হাসে—যদি কেউ ডাকে এবং যদি আমার সাধ্যি থাকে, তবে তাকে একটু সাহায্য করি, এই মাত্র।

যূথিকা হাসে—এই জন্যেই আপনার উপকারের দাম কেউ দিল না।

হিমু—দামই যদি পেলাম, তবে উপকার করা আর হলো কোথায় ?

যূথিকা—আপনার এই বাতিকের কোন অর্থ হয় না।

হিমু—হ্যাঁ, আপনার বাবা তাই বলেছিলেন বটে।

চমকে ওঠে যূথিকা, এবং যূথিকার চোখে একটা বেদনার ছায়াও দেখা যায়।

—বাবার কথা শুনে আপনি সেদিন বোধহয় খুব দুঃখিত হয়েছিলেন ?

হিমু—হয়েছিলাম ; কিন্তু তাতে কি আসে যায় ?

যূথিকা উঠে দাঁড়ায়।—না, আপনার সঙ্গে তর্ক ক'রে কোন লাভ নেই। মোট কথা···

হিমু—বলুন।

যূথিকা—আমি চা খেয়েই শুয়ে পড়বো। আর, আপনি··· সাবধান···

হিমুর চোখের দৃষ্টিও একটু কঠোর হয়ে ওঠে—কিসের সাবধান করছেন ?

যূথিকা—আপনি আবার ঐ দরজার পাশের কোণটিতে কাত হয়ে দাঁড়িয়ে, কাঠের উপর মাথা ঠুকে ঠুকে ঘুমোতে পারবেন না।

হিমুর চোখের কঠোর দৃষ্টিটা যেন হঠাৎ বিস্ময় আর লজ্জায় সব উত্তাপ হারিয়ে শান্ত হয়ে যায়। যূথিকা ঘোষের কাছ থেকে সমবেদনার মত অদ্ভুত একটা কোমল অনুভবের ধমক খেতে হবে, কল্পনা করতে পারেনি হিমু। নিজেরই রুক্ষ মেজাজের উপর রাগ হয় ; এবং হাসতে চেষ্টা করে হিমু—সেদিন গাড়িতে একটুও জায়গা ছিলনা, তাই বাধ্য হয়ে···

যূথিকা—জায়গা থাকলেই বা কি? আপনি আমার কাছে

থাকবেন। এখানেই বসে থাকবেন। নইলে···সত্যিই আমার ভয় করবে হিমাদ্রিবাবু।

হিমু—না না, ভয় কিসের? আপনি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়ুন।

কামরার আর এক প্রান্তের সীটের উপর বসে আছেন যে প্রৌঢ়া বাঙ্গালী মহিলা, তিনি অনেকক্ষণ ধরে যুথিকা আর হিমুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। বাঙ্গালী যখন, তখন যুথিকা ও হিমুর ভাষাও নিশ্চয় বুঝতে পারছেন। সুতরাং, তাঁর চোখে একটা সন্দেহের দৃষ্টি জ্বলজ্বল করবে, তাতে আর আশ্চর্য কি?

যুথিকার চোখ প্রৌঢ়া বাঙ্গালী মহিলার চোখের দিকে পড়তেই হিমুর গায়ে আস্তে একটা ঠেলা দিয়ে আর মুখের হাসি চাপা দিতে চেষ্টা ক'রে যুথিকা চাপা স্বরে ডাকে—হিমাদ্রিবাবু।

—কি?

—দেখছেন তো।

—কি দেখতে বলছেন?

—আস্তে কথা বলুন। সব শুনতে পাচ্ছেন ঐ মহিলা।

—কি শুনতে পেয়েছেন?

—আমাদের কথা।

—তাতে ক্ষতি কি?

—তাতে ভয় আছে।

—কিসের ভয়?

—উনি সন্দেহ করছেন।

—কি সন্দেহ?

—আপনি কিছুই আন্দাজ করতে পারছেন না?

—না।

—উনি সন্দেহ করেছেন, আমরা বোধহয় স্বামী-স্ত্রী নই।
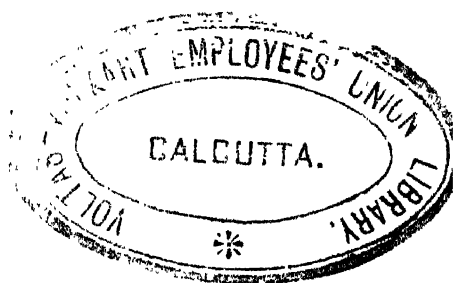
—বাজে সন্দেহ। লজ্জিত হয়ে মাথা হেঁট করে হিমু, আর হাসতে থাকে।

যূথিকা হেসে হেসে ফিসফিস করে।—আঃ, আপনি অকারনে বেচারার ওপর রাগ করছেন। আপনার ব্যবহার দেখে আপনাকে আমার দাদা বলে কেউ মনে করবে না।

হিমু—সে তো সত্যি কথা।

যূথিকা—কোন আত্মীয় বলেও মনে করবে না।

হিমু—হ্যাঁ, তাই বা মনে করবে কেন?

যূথিকা—স্বামী বলেও মনে করবে না।

হিমু—আপনিও বড় বাজে কথা বলতে পারেন।

যূথিকা—আমি বলতে চাই, আমাকে দেখে তো কেউ আমাকে বিবাহিতা মেয়ে বলে মনে করতে পারে না।

হিমু—তা তো নিশ্চয়।

যূথিকা হাসে—তাই উনি বোধ হয় ভাবছেন যে, একটা বেহায়া মেয়ে তার ছেলেবন্ধুর সাথে কোথায় যেন সরে পড়ছে।

হিমু হাসে—আপনি মিছিমিছি মহিলাকে সন্দেহ করছেন, উনি এসব কিছুই ভাবছেন না।

যূথিকা—আপনাকে ও আমাকে যদি দুই বন্ধু বলে উনি মনে করেন, তবে কি ভুল হবে?

হিমু—না, সেটা মনে করা ভুল হবে কেন?

একটা স্টেশনে ট্রেন থেমেছে। যূথিকা ব্যস্তভাবে বলে—চা, আমার চা কই হিমাদ্রি, হিমাদ্রিবাবু।

—দেখি, অন্তত চেষ্টা করে তো দেখি। বলতে বলতে কামরা থেকে নেমে যায় হিমু। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে থাকে যূথিকা। এবং মনে মনে একটা বিক্ষোভ আগে থেকেই তৈরি করে রাখে; যদি শুধু এক পেয়ালা চা নিয়ে আসে হিমু, তবে

বেশ অভদ্রভাবে দুটো কড়া কথা হিমুকে শুনিয়ে দিতে হবে। এই তোমার আক্কেল? তোমার চা কই? বন্ধুত্বের সাধারণ একটা নিয়মও জান না?

নিজের মনের এই কল্পনা নিয়ে মনে মনে হেসে রেগে কতক্ষ নিজেকে মাতিয়ে রেখেছিল, বুঝতে পারেনি যূথিকা। ট্রেনের ইঞ্জিনটা তীব্র একটা শিস দিয়ে রাত্রির বাতাস কাঁপিয়ে দিতেই চমকে ওঠে যূথিকা। আঃ, এক কাপ চা নিয়ে আসতে এত দেরী করছে কেন হিমাদ্রি? সত্যিই তো নিজের হাতে চা-এর পেয়ালা বয়ে নিয়ে আসবার জন্য ওকে বলা হয়নি! একটা চা-ওয়ালাকে ডেকে আনলেই হয়। আর, তারপর হিমাদ্রি যদি এখানে জানালার কাছে, প্লাটফর্মের ঠিক এই জায়গাটিতে আলো-ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে চা-ওয়ালার হাত থেকে পেয়ালাটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে যূথিকার হাতের কাছে তুলে দেয়, এবং তারপর যদি নিজে এক পেয়ালা চা নিয়ে খেতে খেতে যূথিকার সঙ্গে গল্প করে, তা হলেই তো ওকে আর নিছক একটা বাতিকের মানুষ বলে অভিযোগ করতে হয় না। তাহলে মেনে নিতে হবে, বন্ধুত্ব বুঝবার মত মন ওর আছে। এবং বুঝতেও পারা যাবে যে, খুব বোকাটি নয় হিমাদ্রি, বন্ধুত্ব করবার রীতি-নীতি বেশ ভালই জানে।

দুলে উঠলো ট্রেনটা, তারপরেই চলতে শুরু করলো।

কিন্তু হিমাদ্রি? কোথায় হিমাদ্রি? জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সারা স্টেশনের এদিকে আর ওদিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখতে থাকে যূথিকা, হিমাদ্রি কোথাও নেই। লাফ ঝাঁপ দিয়ে কত যাত্রী কত কামরার দরজায় উঠে পড়লো, কিন্তু প্লাটফর্মের কোন প্রান্ত থেকে হিমাদ্রির মত দেখতে কোন ছায়ামূর্তি চলন্ত ট্রেনের এই কামরার দিকে ছুটে আসছে না।

—হিমাদ্রি! চেঁচিয়ে ডাক দেয় যূথিকা। যূথিকার উদ্বিগ্ন

কণ্ঠস্বরের আহ্বান চলন্ত ট্রেনের চাকার শব্দে ছিন্নভিন্ন হয়ে মিলিয়ে যায়। প্লাটফর্মের ল্যাম্পপোস্টগুলি চকিত ছবির মত যূথিকার চোখের উপরে একটা আতঙ্কের ধাঁধা রেখে দিয়ে তরতর ক'রে পার হয়ে যাচ্ছে। বেশ জোরে ছুটতে আরম্ভ করেছে ট্রেন।

—হিমাদ্রি! হিমাদ্রি! কামরার জানালা দিয়ে বাতাসে আর্তনাদ ছুঁড়তে ছুঁড়তে যূথিকার গলা ধরে যায়। নেতিয়ে পড়ে মাথাটা। আর চোখের কোণ দুটো তপ্ত হয়েই ভিজে যায়।

একি হলো? একটা তামাসা করতে গিয়ে, কে জানে কোন বিপদের মধ্যে হিমাদ্রিকে ফেলে দিয়ে চলন্ত ট্রেনটার সঙ্গে হুহু ক'রে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে যূথিকা ঘোষের জীবনটা!

বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়, নিশ্চয় কোন না কোন কামরায় উঠে পড়েছে হিমাদ্রি। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারে না যূথিকা। নিশ্চয় মানুষটা স্টেশনেই কোথাও পড়ে আছে। কিন্তু পড়ে রইল কেন?

একসঙ্গে মনের ভিতরে অনেক ভয় আর অনেক সন্দেহ ছটফট করতে থাকে। এবং জানালা দিয়ে আবার বাইরের দিকে তাকিয়ে, যেন কামরার আলোর চোখটাকে আড়াল ক'রে নিজের চোখ দুটোকে অন্ধকারের গায়ে মুছে ফেলতে চেষ্টা করছে যূথিকা; কি-ভয়ানক ঠাট্টা করে মানুষকে জব্দ করতে পারে হিমাদ্রি।

কতক্ষণে আর একটা স্টেশন আসবে, আর ট্রেনটা থামবে? এবং তারপরেও যদি দেখা যায় যে হিমাদ্রি এল না, তবে? সত্যিই যদি অন্য কোন কামরাতে না উঠে থাকে হিমাদ্রি, তবে?

তবে আর কি? গিরিডি পর্যন্ত ট্রেনের ভিতরে সঙ্গীহীন কয়েকটা ঘণ্টার জীবন চুপ ক'রে সহ্য করতে হবে, এই মাত্র।

ধমক দিয়ে আর রাগ ক'রে নিজেকে বুঝিয়ে দিয়েও বুঝতে পারে যুথিকা, এই কয়েকটা ঘণ্টার জীবনই যে অসহ হয়ে উঠবে। পাঁচটা মিনিটও মনের শান্তি নিয়ে বসে থাকা যাবে না। টান হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়া আর স্বপ্ন দেখা তো দূরের কথা।

বাবা যখন প্রশ্ন করবেন, একলা এসেছিস মনে হচ্ছে, তখন বাবার মুখের উপর ছ'কথা ভাল করে শুনিয়ে দেওয়া যাবে। হিমাদ্রিকে তোমাদের বিশ্বাস করাই ভুল হয়েছে। এবং ভবিষ্যতে যেদিন হিমাদ্রিকে ধরতে পারা যাবে, সেদিন কৈফিয়ৎ চাইতেও অসুবিধা হবে না, এরকম একটা কাণ্ড করলে কেন? চা আনতে গিয়ে পালিয়ে গেলে কেন?

কিন্তু হিমাদ্রির জন্য কেউ যদি এসে কৈফিয়ৎ দাবি করে, কই আমাদের হিমাদ্রিকে কোথায় ফেলে রেখে তুমি একলা হেসে হেসে গিরিডিতে ফিরে এলে মেয়ে, তবে? তবে কি উত্তর দেবে যুথিকা? যদি সিঁদুর দিয়ে রাঙানো সিঁথি নিয়ে, মাথার কাপড়টা একটু সরিয়ে দিয়ে, কুড়ি বছর বয়সের ঢলঢলে মুখটি তুলে কোন মেয়ে এসে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে—কি গো চারু ঘোষের মেয়ে, ওকে কোথায় ফেলে রেখে এলে? তুমি কি মনে করেছো ওর কেউ নেই?

সত্যিই হিমাদ্রির এরকম কেউ আছে কি? যদি থেকে থাকে, তবে সে যে তার চেখের দৃষ্টিকে জ্বলন্ত শিখার মত কাঁপিয়ে আর কেঁদে কেঁদে যুথিকা ঘোষকে অভিশাপ দেবে।—তুমি একটা খেয়ালের তামাসা করে যে সর্বনাশ করলে, সে সর্বনাশ যেন তোমারও হয়।

জানালার উপর মাথা রেখে আর বদ্ধ নিঃশ্বাসের একটা গুমোট বুকের মধ্যে নিয়ে বৃথা ঘুমোবার চেষ্টা করতে গিয়ে ছেঁড়া ছেঁড়া ভাবনার মধ্যে ছটফট করতে থাকে যুথিকা। না,

মাথাটা গরম হয়ে উঠেছে বলেই বোধহয় যত অদ্ভুত কল্পনা আর চিন্তা মাথা জুড়ে লাফালাফি করছে।

সোঁ সোঁ ক'রে হাওয়া কেটে যেন উড়ে যাচ্ছে ট্রেনটা। ভয়ানক শব্দ। বোধহয় একটা নদীর পুল পার হয়ে চলে যাচ্ছে ট্রেন। যূথিকার মাথার উপর যেন ঠাণ্ডা হাওয়ার ফোয়ারা ছুটে এসে পড়ছে। ঘুম আসছে ঠিকই, ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে।

তারপর আর চেষ্টা করতে বা ইচ্ছে করতে হয় না। অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে যূথিকা।

যূথিকার ঘুম কেউ ভাঙ্গায়নি। ঠাণ্ডা বাতাসের ছোঁয়ায় আরাম পেয়ে ঘুমিয়ে পড়া যূথিকার কান দুটোর বধিরতার ঘোর তবু হঠাৎ ভেঙ্গে যায়। শুনতে পায় যূথিকা, ট্রেনের কামরাটা যেন কথা বলছে।

—তুমি ছিলে কোথায়? মেয়েটি এতক্ষণ কি ভয়ানক ছটফট করেছে। শেষে ঘুমিয়ে পড়েছে বেচারা।

—চা তৈরী করাতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল। তা ছাড়া চা-এর দোকানটাও তো প্লাটফর্মের উপরে নয়, বেশ একটু ভেতরের দিকে। হঠাৎ ট্রেনটা ছেড়ে দিতেই দৌড়ে এসে শেষের দিকে একটা কামরায় উঠে পড়লাম।

—কি দরকার ছিল, সামান্য চা-এর জন্য এত দূরে যাবার?

—ভেবেছিলাম, তাড়াতাড়ি চা-টা পেয়ে যাব। কিন্তু···।

—তোমরা যাচ্ছ কোথায়?

—গিরিডি।

—তোমার বাড়ি গিরিডি?

—না; ঠিক আমার বাড়ি গিরিডি নয়।

—শ্বশুরবাড়ি?

—না না, সে-সব কিছু নয়।

—তোমাদের বিয়ে বোধহয় বেশি দিন হয়নি।

—না না, সে-সব কিছু নয়। আপনি খুব ভুল বুঝেছেন।

চমকে চোখ মেলে তাকায় যূথিকা, এবং বুঝতে পারে ঐ প্রৌঢ়া বাঙ্গালী মহিলা হিমাদ্রির সঙ্গে এতক্ষণ ধরে যে-কথা বলছিলেন, সেকথাই ঘুমন্ত যূথিকার স্বপ্নের ভাষা হয়ে কানের মধ্যে বেজেছে। যূথিকার পাশেই বসে আছে হিমাদ্রি। ট্রেনটা থেমে রয়েছে।

যূথিকা—ভ্রুকুটি ক'রে গম্ভীর হয়ে বলে—তুমি এরকম একটা কাণ্ড করলে কেন হিমাদ্রি?

হিমু—আপনি বিশ্বাস করুন যে…।

যূথিকা—বেশি আপনি আপনি করবে না। শুনতে বিশ্রী লাগে। তোমার বয়সের চেয়ে আমার বয়স কিছু কমই হবে।

হিমু—বেশ তো। বিশ্বাস কর; চা-ওয়ালা লোকটা সামান্য এক পেয়ালা চা তৈরী করতে এত দেরি ক'রে দিল যে ট্রেনই ছেড়ে দিল।

যূথিকা—যদি ট্রেনে উঠতে না পারতে, তবে?

হিমু বিব্রতভাবে বলে—হ্যাঁ, তাহলে তোমাকে খুবই বিপদে পড়তে হতো। তোমার বাবার কাছে আমাকে একটা কৈফিয়ৎ দিতে হতো।

যূথিকা—তোমার কেউ একজন এসে যদি আমার কাছে কৈফিয়ৎ দাবি করে বলতো, হিমাদ্রি কোথায়? তবে কি হতো? কি বলে তাকে আমি বোঝাতাম যে, আমার বিশেষ কিছু দোষ নেই?

—আমার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে তোমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইতে আসবে কে? কি বলছো তুমি? হাসালে তুমি।

—কেউ নেই?

—কেউ নেই; তুমি কি জান না?

—আমি জানবো কেমন করে?

—গিরিডির সকলেই তো জানে।

—তা জানুক, আমি গিরিডির সকলের মত নই। আমি কারও হাঁড়ির খবর জেনে বেড়াই না।

—যাই হোক ; বলতে গিয়ে হেসে ফেলে হিমু।—আমার কৈফিয়ৎ তো শুনলে ; এবার বিছানাটা পেতে দিই, কেমন ?

—না, থাক।

—কতক্ষণ জেগে বসে থাকবে ?

—যতক্ষণ পারি।

—না না, রাত জেগে কোন লাভ নেই।

—লাভ আছে।

—কি ?

—গল্প করতে পারা যাবে।

হিমু হাসে—আমার সঙ্গে গল্প করলে তোমার লাভ হবে না যূথিকা।

যূথিকার চোখ আবার গম্ভীর হয়।—তার মানে ?

হিমু হাসে—আমি সত্যিই গল্প-টল্প জানি না, বলতেও পারি না যূথিকা। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা, যাদের আমি পড়াই, তারাও আমার উপর ভয়ানক রাগ করে, গল্প বলতে পারি না বলে। ভুলু একদিন বলেই ফেললো, মাস্টার মশাইটা কিচ্ছু জানে না।

যূথিকা—এই তো বেশ গল্প করতে পারছো।

প্রৌঢ়া বাঙ্গালী মহিলা উপরের আলোটার দিকে তাকিয়ে যেন রাগের সুরে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠেন—কি যে কাণ্ড, ছিঃ ; ভগবান জানেন কি ব্যাপার।

মাথা হেঁট ক'রে মুখের হাসি লুকিয়ে এবং হাতটাকেও লুকিয়ে লুকিয়ে এগিয়ে দিয়ে হিমুর কামিজের পকেটটা ধরে টান দেয় যূথিকা। ফিস ফিস ক'রে বলে—শুনলে তো হিমাদ্রি, মহিলা কি বলছেন ?

হিমু—না, ঠিক শুনতে পাইনি।

যূথিকা—মহিলা একটা সমস্যায় পড়েছেন।

হিমু—কিসের সমস্যা?

যূথিকা—উনি বুঝতে পারছেন না, কে কার সঙ্গে চলেছে। তোমার সঙ্গে আমি যাচ্ছি, না আমার সঙ্গে তুমি যাচ্ছ।

হিমু হাসে—তোমার কাণ্ড দেখে মনে হতে পারে, তোমার সঙ্গেই আমি যাচ্ছি।

যূথিকা—তার মানে, মহিলা তোমাকে একটা অপদার্থ বলে মনে করেছেন।

হিমু—অনেকেই তো তাই মনে করে, মহিলাও তাই মনে করবেন, তার আর আশ্চর্য কি?

যূথিকা—অনেকে মানে কে কে?

হিমু—তা কি আর মনে ক'রে রেখেছি? দেখেছি, অনেকেই তাই মনে করে।

যূথিকা—সেই অনেকের মধ্যে আমিও আছি বোধহয়?

হিমু—থাকলে দোষ কি?

যূথিকা কটমট ক'রে হিমাদ্রির মুখের দিকে তাকায়—ওভাবে বেঁকিয়ে কথা বলো না। ঠিক ক'রে, স্পষ্ট ক'রে বল, তোমার কি ধারণা? আমিও তোমাকে অপদার্থ বলে মনে করি?

হিমু—বললাম তো, তাতে দোষের কি আছে? মনে করলে অন্যায় কিছু হবে না।

কে বলে মাটির মানুষ? বেশ তো ক্ষোভ অভিমান আর অভিযোগের টাটকা রক্তমাংস দিয়ে তৈরী বেশ গভীর বুদ্ধির মানুষ! খুব বুঝতে পারে, খুব দেখতে পায়, আর কিছুই ভুলে যায় না; কি ভয়ানক নিখুঁত হিমাদ্রির মাটির মানুষের ছদ্মবেশটা! ইচ্ছে করলে, ওর মুখের ঐ বোকা-বোকা হাসিটাকেই ঝিক করে

কটা বিদ্যুতের জ্বালায় জ্বালিয়ে দিয়ে মানুষের মুখের দিকে বেশ তো তাকাতে পারে হিমাদ্রি। মানুষের মনের কোমলতার উপর বেশ আঘাত দিয়ে কথা বলতে পারে। যূথিকা ঘোষের মনের সব কৌতুক আর কৌতূহলের দুঃসাহস চমৎকার একটি নিষ্ঠুর বিদ্রূপের খোঁচা দিয়ে রক্তাক্ত ক'রে দিয়ে এখন কেমন নির্বিকার মনে নস্যির ডিবে ঠুকছে হিমাদ্রি।

যূথিকা বলে—আমিও তোমাকে এরকম একটা শক্ত কথা বলতে পারি।

হিমু হাসে—একটা কেন, অনেক বলতে পার।

যূথিকা—মিথ্যে অভিযোগের কথা নয়। সত্যি অভিযোগ।

হিমু হাসে—তোমাকে সময়মত এক পেয়ালা চা এনে দিতে পারিনি, এছাড়া আমার বিরুদ্ধে বোধহয় আর কোন অভিযোগ খুঁজে পাবে না।

যূথিকা—খুঁজে পেয়েছি।

হিমু—কি ?

যূথিকা—তুমি আমাকে একটা অহঙ্কেরে মেয়ে বলে মনে কর।

হিমু হাসে—তা মনে করি, কিন্তু সেজন্য রাগ করি না নিশ্চয়।

যূথিকা—রাগ করবে কেন ? তুমি যে ভয়ানক চালাক। মানুষকে ছোট ভাবতে তোমার বেশ মজা লাগে। আর।...

আনমনার মত কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকে যূথিকা। তারপরে গলার স্বরের একটা রুক্ষ তীব্রতাকে যেন কোনমতে চেপে রেখে আস্তে আস্তে বলে—তাই পরের উপকার ক'রে বেড়াও। ওটা মোটেই তোমার বাতিক নয়। ওটা তোমার ভয়ানক একটা অহঙ্কার। মানুষ নিজেকে কত ছোট ক'রে ফেলতে পারে, তাই দেখে মনে ম মজা করবার জন্য অকারণ পরের উপকার করে বেড়াচ্ছ। গরিডির কেউ তোমাকে বুঝতে পারেনি, কিন্তু আমি বুঝেছি।

হিমু—তুমি যে আমাকে আমার চেয়েও বেশি বুঝে ফেলেছো মনে হচ্ছে।

যূথিকা—আজ্ঞে হ্যাঁ। তুমি নিজেই জাননা যে তুমি।...

হিমু—বলেই ফে

যূথিকা—তুমি কি ভয়ানক চালাক আর অহঙ্কারী!

এক টিপ নস্যি নিয়ে হিমু আবার হেসে উঠে—বেশ, অনেক গল্প তো হলো।

যূথিকা হাসে—এবার ভয়ানক ক্ষদে পেয়েছে।

হিমু—তোমার সঙ্গে খাবার আছে নিশ্চয়?

যূথিকা—আছে। কন্তু সে খাবার খাব না।

হিমু—কেন?

যূথিকা—কোন স্টেশনে ট্রেনটা থামুক। খাবারওয়ালার কাছ থেকে পুরি তরকারী কিনে খাবো।

হিমু—না! খবরদার না।

যূথিকা—তুমি বাধা দেবার কে?

হিমু—আমা ধা না শুনলে কোন লাভ হবে না।

যূথিকা—তার মানে?

হিমু—আমি তোমার সঙ্গের লুচি-সন্দেশ খেতে রাজি হব না।

চমকে ওঠে যূথিকা। এবং মনে মনে সারা গিরিডির একটা অসার ধারণার আনন্দকে ধক্কার দেয়। হিমু দত্তকে চিনতে বুঝতে আর ধরতে পারে ন কেউ। ওর বুকের প্রত্যেকটা নিঃশ্বাস, ওর উদাস আনমনা ভালমানুষী চোখের প্রত্যেকটা দৃষ্টি যে চরম চালাকির লীলাখেলা। যূথিকা ঘোষের মনের গভীরের এত গোপন ইচ্ছা-টাকেও কত সহজে দেখে ফেলেছে হিমাদ্রি।

সত্যি কথা; হিমাদ্রিকে লুচি-সন্দেশ খাওয়াবার একটা ছুতো খুঁজছিল যূথিকা। কন্তু সন্দেহ ছিল যূথিকার মনে, বাস্তিকের

মানুষ হিমাদ্রি যূথিকার খাবারের ঝুড়ির লুচি-সন্দেশ স্পর্শ করতে রাজি হবে না। হিমুর সেই অনিচ্ছাকে জয় করবার জন্য কি কথা বলতে হবে, তা'ও মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল যূথিকা। কিন্তু, তুমি না খেলে আমিও লুচি-সন্দেশ ছোঁব না, একথা বলবার সুযোগও পেল না যূথিকা। ধূর্ত হিমু দত্ত মানুষের মনের একটা সদিচ্ছাকে, একটা সৌজন্যের আগ্রহকেও কি-ভয়ানক আঘাত দিয়ে ব্যথা দিতে জানে।

কিন্তু হিমাদ্রির বুদ্ধির কাছে কি হার মানবে চারু ঘোষের মেয়ে যূথিকা ঘোষ?

যূথিকা বলে—তুমি যদি সত্যিই বাধা দিয়ে আমাকে পুরি-তরকারী খেতে না দাও, তবে মনে রেখ, আমার খাওয়াই হবে না।

হিমু—কেন? তোমার সঙ্গেই তো ভাল খাবার আছে।

যূথিকা—হ্যাঁ আছে। তেমনই থাকবে।

হিমু—তার মানে?

যূথিকা—তার মানে, তুমি যদি সেবারের জার্নির সময় আমার একটা ভুলের কথা ভুলতে না পেরে, শুধু একটা প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছায়…

হিমু হাসে—তুমিও তো মানুষের ভুলের খুঁটিনাটি ধরতে কম যাও না! যাও, আমি তর্ক করতে চাই না।

তর্ক ছেড়ে দিয়ে যূথিকাও হাসে, এবং সে হাসির মধ্যে বোধহয় বিজয়িনীর মনের মত একটা সুখী মনের গর্বও হাসে।—খাবার খাওয়ার পালা একটু পরে শুরু হলেই ভাল হয়; এখন গল্পের পালা থামিয়ে দেওয়া উচিত নয়। কি বল হিমাদ্রি?

হেসে হেসে গল্প করবার আনন্দও অবান্তর কোন প্রশ্নের

আঘাতে এলোমেলো হয়ে যায় না। কথায় কথায় শুধু একটি প্রশ্নকে কয়েকবার টেনে নিয়ে এসে শেষে শান্ত হয়ে যায় যূথিকা।

—তোমার কেউ নেই, এটা কি একটা কথা হলো? একথার কোন মানে হয় না হিমাদ্রি।

হিমু—মানে হোক বা না হোক, কথাটা সত্যি।

যূথিকা—তুমি আমার কথাটাই বুঝতে পারনি।

আশ্চর্য হয় হিমু। না বোঝবার কি আছে? অনেক কথাই তো জিজ্ঞাসা করেছে যূথিকা, যে-কথা হিমুর গিরিডি-জীবনের এক বছরের মধ্যে কোন মানুষ হিমুকে জিজ্ঞাসা করেনি। যূথিকার ছোট ছোট এক একটা সরল প্রশ্নের উত্তরে হিমুও সরল ভাষায় উত্তর দিয়ে দিতে পেরেছে; হ্যাঁ, বাবা-মা দুজনের কেউ এখন আর বেঁচে নেই। দেশের বাড়ি অনেকদিন আগেই বিক্রি হয়ে গিয়েছে। ভাই-বোন কেউ নেই; চাকরির চেষ্টা করতে করতে সেই ডিব্রুগড় থেকে হঠাৎ এই গিরিডিতে এসে পড়া, এই তো ব্যাপার। দেখা যাক, আবার কোন্‌দিকে ভেসে পড়তে হয়।

যূথিকা হেসে ফেলে—সব বলেও একটি কথা বোধহয় বলতে পারলে না হিমাদ্রি। বোধহয় বলতে তোমার লজ্জা করছে।

হিমু—আর কি বলবো বুঝতে পারছি না।

যূথিকা—এমন কেউ একজন তো থাকতে পারে, যে তোমাকে ভেসে পড়তে দিতে চায় না; ধরে রাখতে চায়।

হিমু—তার মানে?

যূথিকা—বিয়ে করনি?

হিমু হো হো ক'রে হেসে ওঠে।—এত কথা শোনার পর তোমার মনে এরকম একটা অদ্ভুত প্রশ্ন দেখা দিল, কি আশ্চর্য?

যূথিকা—বুঝলাম, বিয়ে করনি। কিন্তু···কিন্তু তাতেও প্রমাণ হয় না যে, তোমার কেউ নেই।

হিমু বিরক্ত হয়ে বলে—না নেই। আমি পাগল নই, আমার ওসব অদ্ভুত শখ থাকতে পারে না।

যূথিকাও যেন অদ্ভুত এক জেদের আবেগে আরও জোর দিয়ে বলে—তুমি পাগল নাই বা হলে, কিন্তু গিরিডিতে অন্তত একটা পাগল মেয়ে তো থাকতে পারে; তোমার অদ্ভুত শখ না থাক, অন্য কারও তো থাকতে পারে। সে তোমাকে ভেসে পড়তে দিতে রাজি হবে কেন?

হিমু—না, এরকমও কেউ নেই ।

যূথিকা—কেন নেই?

হেসে ফেলে হিমু—ঠাট্টা করবার আর গল্প করবার কিছু না থাকলেও এসব কথা বলতে হয় না।

যূথিকা—তোমাকে যদি ভয় করতাম, তবে নিশ্চয়ই এসব কথা জিজ্ঞাসা করতাম না।

যূথিকার মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে যায় হিমু। ভয় করে না যূথিকা, কিন্তু ভয় করে না বলেই কি এত ঠাট্টা করতে হয়? চারু ঘোষের মেয়ের মাথার মধ্যে একরকমের পাগলামির পোকা আছে বোধহয়।

কিন্তু, মনটাকে এত গম্ভীর করে রেখেও বুঝতে পারে হিমু দত্ত, যূথিকার প্রশ্নগুলি যেন হিমু দত্তের জীবনের উপর মানুষের মায়ার প্রথম অভিনন্দন। যেকথা কেউ জিজ্ঞাসা করেনি, সে-কথা জিজ্ঞাসা করেছে চারু ঘোষেরই অহঙ্কারী মেয়ে; আপন বলতে কেউ আছে কিনা হিমু দত্তের। আর কটা কথা মনে পড়ে, এই তো সেই যূথিকা ঘোষ; যে মেয়ে হিমাদ্রিবাবু বলে প্রথম ডেকেছিল। সে ডাকের পিছনেও একটা ঠাট্টা ছিল নিশ্চয়; কিন্তু তবু তো ডেকেছিল। এবং শুনতে খারাপও লাগেনি।

কি-যেন বলেছে যূথিকা। বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করে হিমু—কি বললে ?

যূথিকা—তোমাকে বন্ধু বলে ভাবতে সত্যিই আর ভয় করে

হিমুর গম্ভীর মুখ যেন হঠাৎ ভয়ের চমক লেগে কেঁপে ওঠে।—বন্ধু ?

যূথিকা—হ্যাঁ। তোমাকে কি একটা পূজনীয় গুরুজন বলে মনে করবো ভেবেছ

হিমু হেসে ফেলে—কিন্তু ভয় করবার কথা বলছো কেন ?

যূথিকা—ভয় করে না বলেছি।

হিমু—কে ?

যূথিকা খিল খিল করে হেসে ওঠে—তোমার মত একটা একলা অপদার্থ মানুষকে ভয় করবো কেন ?

আস্তে একবার চমকে ওঠে হিমু, তারপরেই অন্যদিকে মুখ ফেরায়।

অনেক রাত হয়েছে। আর বেশি গল্প করলে রাতটা যে চোখের উপরেই ভোর হয়ে যাবে

হিমু বলে—তুমি একবার শুয়ে পড় যূথিকা।

যূথিকা ক্লান্তভাবে বলে—হ্যাঁ।

বাঙ্কের উপর থেকে বেডিং-টা টেনে নামিয়ে সীটের উপর পেতে দেয় হিমু।

যূথিকা বলে—তুমি এই সতরঞ্চিটা ঐ সীটের উপর পেতে ঘুমিয়ে পড় লক্ষ্মীটি। সেবারের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সারাটা পথ কষ্ট ক'রে···

হিমু বলে—না না, কষ্ট করবো কেন ? সেবার কামরাতে জায়গাই ছিল না ; তাই বাধ্য হয়ে··

যূথিকা—আর একটা কথা।

হিমু—কি ?

যূথিকা আস্তে আস্তে বলে—তুমি আমার গায়ের উপর চাদর-টাদর মেলে দিতে চেষ্টা করো না। কেমন ?

হিমু—আচ্ছা।

যূথিকা—কিছু মনে করলে না তো ?

হিমু—না।

যূথিকা—মহিলা হয়তো একটা বাজে সন্দেহ করে বসবেন সেই জন্যেই বলছি।

হিমু—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ।

এ কি অদ্ভুত কথা বলছে দিদি! বাবা শুনলে যে রাগ করবে। আর মা নিশ্চয় আরও রাগ করে শেষে ধমক দেবে, না, এরকম বিশ্রীভাবে বেড়াতে যাবার কোন মানে হয় না।

যূথিকার কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে দুই ভাই, বীরু আর নীরু। একবার বাড়ির বাইরে বেড়িয়ে আসতে চায় দিদি; বীরু আর নীরুকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়।

কিন্তু ঠিক কোথায় যে বেড়াতে যেতে চায়, সেটা ঠিক স্পষ্ট করে বলতে পারছে না দিদি। উশ্রীর দিকে নয়; বরাকরের দিকে নয়; বেনিয়াডি কোলিয়ারি যাবার সড়কের দিকে, যেখানে মাঠের উপর অনেক পলাশের মাথা লাল ফুলে রঙীন হয়ে রয়েছে, সেদিকেও নয়। তবে কোথায় ? কোন্ দিকে ?

যূথিকা বলে—ওসবই তো দেখা; তার চেয়ে বরং···

বীরু—মহেশমুণ্ডার দিকে ?

যূথিকা—না, অতদূরে নয়।

নীরু—তবে কি পরেশনাথের দিকে ?

যূথিকা—না; পায়ে হেঁটে কি অতদূরে বেড়াতে যাওয়া যায় ?

বীরু আর নীরু একসঙ্গে আশ্চর্য হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—পায়ে হেঁটে ?

যুথিকা—হ্যাঁ, তাতে কি হয়েছে ? এত বড় বড় চোখ করে আশ্চর্য হবার কি আছে ?

উদাসীন নামে এত বড় বাড়ির আত্মাটাও বোধহয় চমকে উঠেছে। বেড়াতে যেতে চায় যুথিকা। কিন্তু এত সুন্দর জায়গা থাকতে ঐ শ্রীহীন শহরের ভিতরে একটু ঘুরে ফিরে বেড়িয়ে আসতে চায়। তাও আবার গাড়িতে নয়, শুধু পায়ে হেঁটে। তা ছাড়া এমন একটা অসময়ে।

শহরের দিকে, যে-দিকে এগিয়ে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে জগতের যত ধুলো-ময়লার ভিড়, যত বাজে মানুষের ছুটোছুটি আর শোরগোল, যত দীনতা আর হীনতার ছায়াও পথের উপর আর দু'পাশে ছড়িয়ে আছে। শর্মা ব্রাদার্সের অমন সুন্দর ভ্যারাইটি স্টোর্সের কাছে যেতে হলেও অনেক বাজে মানুষের ভিড়ের গা ঘেঁষে এগিয়ে যেতে হয়। গাড়ি ছাড়া কোনদিনও পায়ে হেঁটে শহরের কোন দোকানে আসেনি চারু ঘোষের ছেলে মেয়ে।

কিন্তু যুথিকা যে-কথা বলছে, সেটা দোকানে-টোকানে যাবার পরিকল্পনাও নয়। কোন শখের জিনিস কেনবার কথাও ওঠেনি। শুধু শহরের ভিতরেই এদিকে-ওদিকে একবার ঘুরে আসতে চায় যুথিকা। বাজারের দিকে, চকের দিকে, স্টেশনের দিকে। বিনা দরকারে শহরের যে-সব পথে ঘুরে বেড়াবার কোন অর্থ হয় না, সেই সব পথেই বেড়িয়ে আসবার জন্য অদ্ভুত এক ইচ্ছার খেয়ালে যেন দুরন্ত হয়ে উঠেছে যুথিকা ঘোষের মন।

ভয় পায় নীরু।—কিন্তু রাস্তায় যে ভিখিরী আছে দিদি ; নোংরা খেঁকি কুকুরও আছে।

যুথিকা হাসে—থাকুক না ; ভয় কিসের ?

দিদির সাহসের হাসি দেখে আশ্বস্ত হয় নীরু।

এবং, তারপর আর দেরি হয় না। চারু ঘোষের মেয়ে যূথিকা ঘোষ, সঙ্গে চারু ঘোষেরই দুই ছেলে বীরু আর নীরু, যখন উদাসীনের ফটক পার হয়ে সড়কের ধুলো মাড়িয়ে শহরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে, তখন উদাসীনের মালীটাও একটু আশ্চর্য হয়ে হাঁ করে তাকিয়ে দেখতে থাকে।

মাত্র বিকেল হয়েছে। আদালত থেকে চারু ঘোষের বাড়ি ফিরতে এখনও বেশ দেরি আছে; এবং চারু ঘোষের স্ত্রীও এখন ডাক্তারের উপদেশ অনুযায়ী তিন ঘণ্টার রেস্ট নেবার জন্য উপরতলার একটি ঘরে নীরবতার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে আছেন।

এত রোদ! এখন যে ঠিক বেড়াতে যাবার সময়ও নয়। কিন্তু যূথিকা ঘোষের প্রাণটা যেন উদাসীনের জীবনের এতদিনের নিয়মের শাসন ভঙ্গ করবার কৌতুকে দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে। বীরু আর নীরুকে হেসে হেসে আশ্বাস দেয় যূথিকা—না না; বাবা কচ্ছু বলবে না বীরু। মা'ও বলবে না নীরু। দেখো, আমার কথা সত্যি হয় কিনা।

আরও কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর, যূথিকা ঘোষের প্রাণের এই দুরন্ত অবাধ্যতার আনন্দ যেন মুখর হয়ে হেসে ওঠে। বীরু আর নীরুর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে বলে—যদি একটু বকুনি খেতে হয় তো খাব

যূথিকার সাজটাও বেড়াতে যাবার মত সাজ নয়। বীরু বলে—তোমাকে বড় অভদ্র দেখাচ্ছে দিদি।

—কেন? চমকে ওঠে যূথিকা।

নীরু বলে—বিচ্ছিরি ড্রেস করেছো, একেবারে গরীব লোকের মত।

ঠিক কথাই বলেছে বীরু আর নীরু। যূথিকা ঘোষের পায়ে এক জোড়া চটি, আর গায়ে এলোমেলো করে পরা একটা রঙীন ছাপাশাড়ি ও ছিটের ব্লাউজ। খোঁপা নয়; বিনুনীও নয়; সাবান-ঘষা

মাথার চুল এতক্ষণে শুকিয়ে আর রুক্ষ হয়ে ফেঁপে উঠেছে। স্নানের পর ঘাড়ে আর গলায় যে সামান্য একটু পাউডার ছড়ানো হয়েছিল, সে পাউডারের কোন চিহ্নও এখন আর নেই। স্নানের সময় গলার হার আর কানের দুলও খুলে রাখা হয়েছিল। সেগুলিও আর পরা হয়নি। আয়নার দেরাজের মধ্যেই সেগুলি পড়ে আছে।

চেহারাটা অভদ্রের মত দেখাচ্ছে, গরীবের মত দেখাচ্ছে, কিন্তু খারাপ দেখাচ্ছে কি? প্রশ্নটা হয়তো মুখ খুলে বলেই ফেলতো যূথিকা ঘোষ; আর বীরু ও নীরুর চোখের বিস্ময়ের দিকে তাকিয়ে বুঝে ফেলতে পারতো যূথিকা, একটুও খারাপ দেখাচ্ছে না নিশ্চয়।

কিন্তু প্রশ্ন করতে হয় না; কারণ বীরুই হঠাৎ যূথিকার মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে একটা ছেলেমানুষী আনন্দের কথা বলে ফেলে—তোমার গায়ে অনেক রক্ত আছে দিদি।

—কি করে জানলে?

—তোমার মুখটা কি চমৎকার লাল হয়ে উঠেছে।

হাসতে গিয়ে আরও লাল হয়ে ওঠে যূথিকার মুখ। তবে আর সন্দেহ নেই; উদাসীনের মেয়ের মুখ পথের রোদের ছোঁয়ায় একটুও অসুন্দর হয়ে যায়নি; একটুও খারাপ দেখাচ্ছে না যূথিকাকে। বরং, বীরুর চোখের ঐ বিস্ময় লক্ষ্য করবার পর বিশ্বাস করতে হয়, যূথিকার এই সাজহীন মূর্তিটা নতুন রকমের একটা প্রাণের আভায় রঙীন হয়ে আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে।

যূথিকা জানে না, বীরু আর নীরুও জানতে পারে না, কিসের জন্য আর কি দেখবার জন্য পথের এত ভিড় পার হয়ে, এত শোরগোল শুনতে শুনতে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। কোন কাজ নেই, দরকার নেই, কোথাও থামবার আর ফিরোবার কথা নেই, শুধু শহরের ভিতর এদিকে-ওদিকে একটু ঘুরে বেড়ানো, এই মাত্র।

ঘুরে বেড়াতে একটুও খারাপ লাগে না। লোহার পুলটা পার হবার সময় ট্রেনছাড়া একটা একলা ইঞ্জিন ভয়ানক চিৎকার করে আর ঘন কালো ধোঁয়ার স্তবক ধমকে ধমকে উড়িয়ে দিয়ে ছুটে চলে গেল। চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে উদাসীনের দিদি আর দুই ভাই। ইঞ্জিনের ধোঁয়ার কুণ্ডলী থেকে মোটা মোটা কয়লার গুঁড়ো যূথিকার রুক্ষ চুলের উপর ঝরে পড়ে।

ছুটন্ত ইঞ্জিনের দিকে তাকিয়ে হাততালি দিয়ে হেসে ওঠে বীরু আর নীরু। তারপর যূথিকার চুলের উপর কয়লার গুঁড়োর ছড়াছড়ি দেখে আরও জোরে হাততালি দেয়।

যূথিকা বলে—দুষ্টুমি করো না; ছিঃ—আচ্ছা, এইবার চল, একবার চকের কাছে গিয়ে···তারপর একবার স্টেশনের দিকটা ঘুরে এসে, তারপর···

বিচিত্র এক উদ্‌ভ্রান্তির অভিযান! এগিয়ে যেতে থাকে যূথিকা, আর বীরু, নীরু। চকের দোকানগুলিতে যেমন ভিড় তেমনই হৈ-হৈ। কত মানুষ আসছে আর যাচ্ছে, কত ব্যস্ততা। কত কথা বলছে, হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি করছে, আবার ঝগড়াও করছে মানুষগুলি। গাড়িতে করে এই চক কতবার পার হয়ে গিয়েছে যূথিকা, কিন্তু কোনদিন ভিড়ের মুখগুলির দিকে তাকাবার কোন দরকার হয়নি। তাকাতে ইচ্ছেও করেনি।

কিন্তু আজ বারবার তাকাতে ইচ্ছে করে। দরকারের মানুষগুলি আসছে যাচ্ছে আর ভিড় করে থমকে রয়েছে, দেখতে বেশ লাগে। কিন্তু···কি আশ্চর্য, একটা চেনা মুখ এখন পর্যন্ত দেখতে পাওয়া গেল না। পথের ভিড়গুলি যেন একটা নিরেট অচেনা জগতের কতগুলি হাসাহাসির, মুখরতার আর ব্যস্ততার ভিড়।

মাঝে মাঝে এক-একবার চমকেও ওঠে যূথিকা ঘোষের খেয়ালের চোখ। ঠিক হিমাদ্রির মত নীল রঙের কামিজ গায়ে, এক

ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে একটা ফলের দোকানের ভিড়ের সঙ্গে মিশে রয়েছেন। আশ্চর্য, হিমাদ্রি নয় তো? কিন্তু আশ্চর্য হবার কি আছে? চকের এই সব দোকানে এসে এত মানুষের যদি ভিড় করবার দরকার থাকে, তবে হিমাদ্রিই বা আসবে না কেন?

না হিমাদ্রি নয়। নীল রঙের কামিজ বটে, কিন্তু আস্তিন ছুটো গোটানো নয়। আর পায়ে এক জোড়া নাগরা সাদা রবারের জুতো নয়।

স্টেশনের কাছে এদিকে ওদিকে ঘুরে ঘুরে, আর পথের ভিড়ের অনেক মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যেন ক্লান্ত হয়ে যায় যূথিকা ঘোষের এই বিচিত্র উদ্‌ভ্রান্তির অভিযান। নীল রঙের কামিজ, আস্তিন ছুটো গোটানো, আর পায়ে সাদা রবারের জুতো, এমন কোন মূর্তি শহরের এত ভিড়ের কোন ভিড়ের মধ্যে দেখা গেল না।

বীরু বলে—এবার কোন দিকে যাবে দিদি?

যূথিকা বলে—আর কোন দিকে না।

নীরু—কেন দিদি?

যূথিকা—সন্ধ্যে হয়ে এসেছে।

বীরু—তাতে কি হয়েছে?

যূথিকা বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—কারও মুখ স্পষ্ট করে যে দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে না। কাউকে চিনতে পারা যাবে না।

নীরু ভয়ে ভয়ে বলে—তবে এবার বাড়ি ফিরে চল দিদি।

যূথিকা বলে—হ্যাঁ, চল।

ফটক পার হয়ে উদাসীনের বারান্দার উপর এসে দাঁড়াতেই বুঝতে পারে যূথিকা, হ্যাঁ বকুনি খেতে হবে। বীরু আর নীরুও বুঝতে পারে বোধ হয়, তা না হলে ওরা ছু'জনে ওভাবে যূথিকার এলোমেলো চেহারাটার আড়ালে মুখ লুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার চেষ্টা করে কেন?

অনেকক্ষণ হলো আদালত থেকে ফিরেছেন চারু ঘোষ। অনেকক্ষণ হলো বিরামের ঘুম থেকে জেগে উঠেছেন চারু ঘোষের স্ত্রী কুসুম ঘোষ। অনেক ডাকাডাকি করেও উদাসীনের ছেলে-মেয়ের কোন সাড়া না পেয়ে অনেক আতংক অনেকক্ষণ ধরে সহ্য করেছেন। তারপর মালীর কথা শুনে কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছেন। কিন্তু মনের রাগটাকে শান্ত করতে পারেননি। বলা নেই কওয়া নেই, অনুমতি না নিয়ে, একটা জানান না দিয়ে বাচ্চা ভাই দুটোকেও সঙ্গে নিয়ে পায়ে হেঁটে কোথায় গেল বাইশ বছর বয়সের কাণ্ডজ্ঞানহীন ধিঙ্গি? গণেশবাবুর স্ত্রীর মত নিন্দুকের চোখে পড়লে আর রক্ষা নেই। এক বেলার মধ্যেই বোধ হয় সারা গিরিডির সব পাড়া ঘুরে দুর্নাম রটিয়ে দেবে, কিপ্‌টে চারু ঘোষ শুধু নিজে একাই গাড়ি চড়ে; ছেলেমেয়েগুলো পায়ে হেঁটে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়ায়।

কি আশ্চর্য, ভেবে কোন কারণই ঠাহর করতে পারেন না চারু ঘোষ আর কুসুম ঘোষ; উদাসীনের সুশ্রী জীবনের শিক্ষা-দীক্ষা পেয়েও আর এত বড় হয়ে ওঠবার পরেও যূথিকার মত মেয়ের মনে আবার এ কোন্ রকমের অপরুচির অনাচার? গাড়ি ছাড়া কোন দিন বেড়াতে বের হয়েছে যূথিকা, এমন ঘটনা স্মরণ করতে পারেন না কুসুম ঘোষ; কারণ এমন ঘটনা কোনদিনই ঘটেনি। তবে আজ হঠাৎ এমন অধঃপতনের ধুলো পায়ে গায়ে আর মাথায় মাখবার জন্য এ কেমন নোংরা শখের খেলা খেলে এল মেয়েটা? কেন, কিসের জন্য, কোথায় গিয়েছিল যূথিকা? কার সঙ্গে কথা বলে এল?

সন্দেহ করেন কুসুম ঘোষ, নিশ্চয় একটা কাণ্ড করে এসেছে যূথিকা। তা না হলে, না বলে-কয়ে একটা চুপি-চুপি চেষ্টার মত বাইরে বের হয়ে গেল কেন? বিশ্রী কাণ্ড করতে হলে যে ঠিক

এই ধরনের চুপি-চুপি চেষ্টা করতে হয়। কুসুম ঘোষের জেঠতুতো দাদা, আই-সি-এস মোহনদা'র বউ বর্ণালীর কথা মনে পড়ে। চাল-চলনে প্রায় মেম সাহেব হয়ে গিয়েছে যে বর্ণালী বউদি; একশো টাকা মাইনের মগ কুকের হাতের রান্না যত রোস্ট গ্রিল আর ফ্রাই ছাড়া যার মুখে কোন বাংলা রান্না রোচে না; সেই বর্ণালী বউদি লুকিয়ে লুকিয়ে চাপরাশিকে দিয়ে বাজারের তেলেভাজা বেগুনি আনিয়ে আর ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে লুকিয়ে লুকিয়ে খেত।

যূথিকার কাণ্ডটা প্রায় এই রকমের একটা চুপি-চুপি সেরে আসা নোংরা শখের কাণ্ড। যূথিকার মুখের দিকে তাকিয়ে ধমক দেন কুসুম ঘোষ—ছিঃ।

যূথিকা হাসে—কি হলো মা?

—হঠাৎ এরকম একটা কাণ্ড করবার মানে কি?

যূথিকা—শহরের ভেতরে একটু এদিক-ওদিক বেড়িয়ে এলাম।

—কেন? কারণ কি?

যূথিকা হাসে—এমনি; কোন কারণ নেই।

—তার মানে পাগলামিতে পেয়েছিল?

চারুবাবু বলেন—যাক্ গে; আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। কুসুম ঘোষ চুপ করেন; এবং চারুবাবু আরও গম্ভীর হয়ে বলেন—মোট কথা; তোমার কাণ্ড দেখে আমি বড় দুঃখিত হয়েছি যূথিকা। আমাদের প্রেস্টিজের দিকে চোখ রেখে কাজ করবে। উদাসীনের মেয়ে উদাসীনের কালচার ভুলে যাবে কেন?

উদাসীনের কালচারের উপর আবার একটা উপদ্রব। এই উপদ্রবও উদাসীনের মেয়ে যূথিকা ঘোষের একটা খেয়ালের কাণ্ড।

এবং এই খেয়ালটাও একটা নোংরা শখের খেয়াল। খুব দুঃখিত হলেন চারু ঘোষ, এবং খুব রাগ করলেন কুসুম ঘোষ।

দিনটা ছিল যূথিকা ঘোষেরই জন্মদিনের উৎসবের দিন।

সেদিন আদালতে যাননি চারু ঘোষ। সেদিন স্কুলে যায়নি বীরু আর নীরু। সেদিন শহরে গিয়ে শর্মা ব্রাদার্সের ভ্যারাইটি স্টোর থেকে যূথিকার জন্য দু'শো টাকা দিয়ে এক গাদা ফরাসী পারফিউমারির সৌরভ-সামগ্রী আর প্রসাধনের উপচার কিনে এনেছেন চারু ঘোষ। দশ শিশি সেণ্ট, পাস্তুরাইজ্‌ড্‌ ফেস ক্রীম, অল-টোন শ্যাম্পু, স্কিন টনিক লোশন, ওয়াটারপ্রুফ মাসকারা আর ব্রিউটি গ্রেন।

সকাল আটটা থেকে শুরু করে বেলা বারটা পর্যন্ত অনেক স্নেহময় আগ্রহ উৎসাহ আর যত্ন নিয়ে কুসুম ঘোষ রান্না করেছেন, মিষ্টি পোলাও, রুই মাছের ক্রোকে, মাংসের দম্পক্ত, নারকেল-চিংড়ি আর ছানার পায়েস।

তখনো টেবিলে খাবার সাজানো হয়নি; আর চারু ঘোষের স্নান সারাও বাকি ছিল। কিন্তু উদাসীনের মেয়ে যূথিকা ঘোষ ওর সেই সুরভিত আর প্রসাধিত সুন্দর চেহারাটাকে নিয়ে, ঝলমলে শাড়ির আভা ছড়িয়ে দুলিয়ে আর ছুটিয়ে বার বার যেন একটা পেটুকে লোভের আবেগে রান্নাঘরের দরজার কাছে এসে কুসুম ঘোষকে বিরক্ত করতে থাকে।—রান্না শেষ হলো কি মা?

কুসুম ঘোষ হাসেন—হ্যাঁ রে লোভী মেয়ে। শেষ হয়ে এসেছে; শুধু জলপাই-এর চাটনিটা বাকি।

জলপাই-এর চাটনি রাঁধতে এমন কি আর সময় লাগে? পনর মিনিট পার হতে না হতে আবার ছুটে আসে যূথিকা।—হলো চাটনি?

কুসুম ঘোষ হাসেন—হ্যাঁ। এবার ওকে স্নান সেরে নিতে বল।

যূথিকা—বলছি…হ্যাঁ…একটা কথা।

—কি ?

যূথিকা—তিনটে থালাতে খাবার সাজিয়ে দাও তো।

কুসুম ঘোষ আশ্চর্য হন—তিনটে থালাতে ?

যূথিকা—হ্যাঁ।

—কিসের খাবার ?

যূথিকা—এই যে, এইসব পোলাও টোলাও···সবই কিছু কিছু করে তিনটে থালাতে সাজিয়ে দাও।

কুসুম ঘোষের চোখে এইবার একটা ভ্রুকুটি ফুটে ওঠে—কার জন্যে ?

যূথিকা—গিরধারীর জন্যে ; জানকীরামের জন্যে আর সোমরার জন্যে।

—কি বললি ? কুসুম ঘোষ যেন একটা আর্তনাদ করে তাঁর যন্ত্রণাক্ত বিস্ময়টাকে সামলাতে চেষ্টা করেন।

ড্রাইভার গিরধারী ; চাকর জানকীরাম আর মালী সোমরার জন্য তিনটে থালাতে এই সব আভিজাতিক খাবার নিজের হাতে সাজিয়ে দিতে হবে, যূথিকা যেন কুসুম ঘোষের হাত দুটোকে একটা অভিশাপ সহ্য করতে বলছে। বলতে একটুও লজ্জা পেল না যূথিকা ? একটু ভেবে দেখলো না, কি অদ্ভুত কথা বলছে ? ভুলে গেল মেয়েটা, এরকম নোংরা কাণ্ড যে এই উদাসীনের পঁচিশ বছরের জীবনে কোনদিন সম্ভব হয়নি। কুসুম ঘোষ বলেন—না ; তোমার বাজে খেয়াল বন্ধ কর যূথি।

যূথিকাই এইবার আশ্চর্য হয়—আমার জন্মদিনে আমরা সবাই পোলাও টোলাও খাব, আর ও বেচারারা বাড়িতে থেকেও খাবে না ?

—না।

যূথিকা নাক সিঁটকে বিড়বিড় করে—কি বিশ্রী ব্যাপার !

—বিশ্রী হয়ে গিয়েছে তোর বুদ্ধিসুদ্ধি।

—যাকগে! আবার নাক সিঁটকে নিয়ে গম্ভীর হয়ে, আর ছটফট করে চলে যায় যূথিকা।

কুসুম ঘোষের সন্দেহ হয় এবং দু'চোখের ক্ষুব্ধ দৃষ্টি তুলে দেখতে থাকেন, কেমন যেন একটা আধপাগলা রকমের মুখ করে ধেই ধেই ক'রে চলে গেল মেয়েটা। মেয়েটার ব্যবহারের রকম-সকম, কথা বলবার ঢং, চোখের চাউনি, হাঁটা-চলা আর বুদ্ধি রুচি ইচ্ছে টিচ্ছে সবই যেন কেমনতর বিশ্রী হয়ে যাচ্ছে।

মেয়েটার জন্মদিন ; তাই খুব বেশি ধমক-ধামক করতে ইচ্ছে করে না। তাই রাগ সামলাতে চেষ্টা করেন কুসুম ঘোষ।

চারু ঘোষও সবকথা শুনতে পেয়ে গম্ভীর হয়ে গেলেন। মেয়েটাকে যেন উদাসীনের জীবনের রীতি আর অভ্যাসগুলিকে অপমান করবার শখে পেয়েছে। কিংবা কাণ্ডজ্ঞানই হারিয়েছে। তা না হলে বুঝতে পারে না কেন, এরকমের কাণ্ড করলে উদাসীনের প্রেস্টিজ নষ্ট করা হয়।

যাই হোক, খাবার টেবিলের আনন্দটা আর নষ্ট করেনি যূথিকা। কোন বিশ্রী উপদ্রব করেনি। বরং, শেষ পর্যন্ত দেখতে পেয়ে খুশি হলেন, আর একটু নিশ্চিন্ত হলেন চারু ঘোষ এবং কুসুম ঘোষ, বীরু আর নীরুর লোভের সঙ্গে সমানে তাল দিয়ে সব খাবারের সব স্বাদুতা একেবারে চেটেপুটে খেল যূথিকা ; প্রত্যেকবার জন্মদিনের উৎসবের দিনে একটু বেশি উৎফুল্ল হয়ে বীরু নীরুর সঙ্গে যে সব গান গায় আর গল্প করে যূথিকা, এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না।

উদাসীনের পিতা আর মাতার মুখের অপ্রসন্ন ভাবটাও শেষ পর্যন্ত হাসিচাপা পড়ে। মনে মনে বোধহয় একটু আশ্বস্ত হন এবং একটু হাঁপও ছাড়েন চারু ঘোষ আর কুসুম ঘোষ ; না

যূথিকার মনের এই ছন্নছাড়া খেয়াল বোধহয় একটা বুদ্ধিহীন আমোদের খেলা মাত্র; ফিটের ব্যারামের মত কোন ব্যারাম নয়। গিরধারীকে, জানকীরামকে, আর সোমরাকে—একটা ড্রাইভার, একটা চাকর আর একটা মালীকে হঠাৎ সমাদর করে পোলাও-টোলাও খাওয়াতে গেলে ওরাই যে ভয় পেয়ে চমকে উঠবে; যূথিকা বোধহয় ওদের ঐ ভয়ের চমক দেখে একটু মজা পেতে চায়। তাই কি?

কুসুম ঘোষ বলেন—আমার মনে হয়, যূথিকা শুধু একটু মজা করবার জন্য এরকমের একটা কাণ্ড করতে চেয়েছিল।

চারু ঘোষ—তা যদি হয়; তবে রাগ করবার কিছু নেই। কিন্তু আমার কেমন একটা সন্দেহ হয় যে....

—কি? কুসুম ঘোষ আতঙ্কিতের মত তাকিয়ে প্রশ্ন করেন।

চারুবাবু বলেন—আমার সন্দেহ হয়, যূথিকা বোধহয় আজকাল বাজে বই-টই পড়ছে।

কুসুম—হ্যাঁ, গাদা গাদা নভেল পড়ে দেখেছি।

চারুবাবু—না না, নভেল-টভেলের কথা বলছি না। ওতে কিছু হয় না; আমার সন্দেহ হয়, যূথিকা আজকাল বিবেকানন্দের বই-টই পড়ছে না তো?

কুসুম অবিশ্বাস করেন—বিবেকানন্দের বই যূথিকা পড়বে কোন্ দুঃখে?

চারুবাবু—দুঃখে নয়; খেয়ালে। বাতিকে। সেই জন্যেই তো বলছি। এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে।

কুসুম আশ্চর্য হন—তুমি কবে বিবেকানন্দের বই পড়লে?

চারুবাবু—আমি না; আমি দেখেছি একজনকে, বিবেকানন্দের বই পড়তে পড়তে শেষে জীবনের সব প্রসপেক্টের কি ভয়ানক সর্বনাশ করে কি হয়ে গেলেন নন্তকাকা।

কুসুম—নন্তকাকা কে ?

চারুবাবু—আমারই বন্ধু—এক কলেজের বন্ধু ফটিকের আপন কাকা। ভদ্রলোক কেমব্রিজের এম-এ ; দেশে ফিরে এসেই আটশো টাকা মাইনের একটা সরকারী সার্ভিস পেলেন ; ভেবে দেখ, সে-সময়ের আটশো টাকা ; তার মানে, আজকের প্রাইস ইনডেক্স অনুসারে বত্রিশ শো টাকা। ভদ্রলোক সে সার্ভিস নিলেন না ; একটা অজ পাড়া-গাঁয়ে গিয়ে নিজেই একটা স্কুল করলেন। আমি নিজের চোখে দেখেছি, স্কুল বাড়ির কাছে কাউ-শেডের মত একটা ঘরের ভেতর বসে নিজের হাতে রান্না করছেন নন্তকাকা ; ভাত, ডাল আর ঢেঁড়সের চচ্চড়ি ; বাস্ ! কী সাংঘাতিক অবস্থা।

কুসুম—ইচ্ছে করে কেন এরকম অবস্থা করলেন নন্তকাকা ?

চারুবাবু—বললাম তো, বিবেকানন্দের বই পড়বার অভ্যাসে পেয়েছিল। গরীব হয়ে যাবার বাতিকে ধরেছিল।

চারুবাবুর সন্দেহটাকে সন্দেহ করবার মত মনের জোর আর পান না কুসুম ; এবং একটু ভয়ও পান বোধহয়। এবং, একদিন হঠাৎ যুথিকার পড়ার ঘরে ঢুকে ভয়ের কথাটা একটু কৌশল করে বলেই ফেললেন কুসুম।—ভাল বই-টই পড়বি ; বিবেকানন্দের বই-টই পড়ে কোন লাভ নেই।

যুথিকা হাঁ করে আর চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকে—বিবেকানন্দ কে ?

কুসুম—বিবেকানন্দ, আবার কে ?

যুথিকা—আমি জানি না ; কোনদিন এরকম একটা নামও শুনিনি।

কুসুমের চোখের দৃষ্টিটাই যেন হঠাৎ খুশি হয়ে হেসে ওঠে। তাঁর কৌশলের প্রশ্নটাই সার্থক হয়েছে। বৃথা সন্দেহ, অযথা দুশ্চিন্তা।

এবং চারুবাবুর কাছে গিয়ে হেসে ফেলেন কুসুম।—মেয়েটার সামান্য ছুটো-একটা খেয়ালের কাণ্ড দেখে মিছিমিছি বড় বেশি ভাবনা করা হচ্ছে ; ছিঃ।

চারুবাবুও একটু লজ্জিত হয়ে হাসতে থাকেন।

উদাসীনের বারান্দার চেয়ারগুলির উপর রোজই সকাল বেলায় যে-সব মানুষকে বসে থাকতে দেখা যায়, তারা সবাই মক্কেল। মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলাতেও ছু'চারজনের সমাগম দেখা যায়।

কিন্তু আজ সন্ধ্যায় উদাসীনের ফটক পার হয়ে, ছু'চোখে কেমন একটা উৎসাহের দৃষ্টি নিয়ে, আর আস্তে আস্তে হেঁটে এসে উদাসীনের বারান্দার উপর দাঁড়ালো যে মানুষটা, তাকে দেখলেই বোঝা যায়, মোটেই মক্কেল মানুষ নয়। তবে কে? কিসের জন্যই বা এসেছে ?

চারুবাবু বাড়িতে নেই। কুসুম ঘোষও নেই। উদাসীনের বাপ-মা ছু'জনেই বেড়াতে বের হয়েছেন। বীরু-নীরুও সঙ্গে গিয়েছে। বাড়িতে আছে শুধু যুথিকা। যুথিকাকে আজ সকাল থেকে বিকালের মধ্যে অনেকবার হাঁচতে আর কাশতে দেখা গিয়েছে ; একটু টেম্পারেচারও হয়েছে। কুসুম বলেছেন, সাবধান যুথি! তুমি আজ জানালার কাছেও দাঁড়াবে না, বেড়াতে যাওয় তো দূরের কথা।

উপর তলার সেই ঘর ; যেটা যুথিকা ঘোষের পড়ার ঘর ; তারই ভিতরে একটা চেয়ারের উপর বসে উলের মাফলার গলায় জড়াতে জড়াতে হঠাৎ চোখে পড়ে যুথিকার, ফটক পার হয়ে ভিতরে ঢুকলো একটা মানুষ, যে মানুষকে মক্কেল বলে মনে হয় না। হিমাদ্রি গোছের একটা মানুষ বলে মনে হয়। বয়সের

দিক দিয়েও প্রায় হিমাদ্রিরই মত। গায়ের জামা-কাপড়ের চেহারাও প্রায় সেই রকমের। খয়েরী রঙের একটা আধা-আস্তিন পাঞ্জাবি, কেজো মানুষে মত মালকোঁচা দিয়ে পরা ধুতি ; ধুতিটা অবশ্য ময়লা নয়। হিমাদ্রিরও ময়লা ধুতি পরা অভ্যাস নয়। সাদা রবারের জুতো না হলেও আগন্তুকের পায়ে সাদাটে এক জোড়া চামড়ার চটি দেখা যায়। কি আশ্চর্য, ভদ্রলোককে দেখলে হিমাদ্রিরই কথা মনে পড়ে যায়।

উদাসীনের যে মেয়েকে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে গায়ে ঠাণ্ডা লাগাতে নিষেধ করে গিয়েছেন উদাসীনের মা, সেই মেয়ে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে ওঠে ; জানালার কাছে গিয়ে একবার দাঁড়ায়। তার পরেই উপরতলা থেকে তর্‌তর্‌ করে নেমে এসে একেবারে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়, যেখানে সারি সারি টবের ফুলগাছগুলিকে দুলিয়ে দিয়ে ফুর্‌ফুর্‌ করছে অফুরান ঠাণ্ডা হাওয়া।

—কাকে চান ?

যূথিকার প্রশ্ন শুনে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় আগন্তুক যুবক। এবং উত্তর দেয়—আমি চারুবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

—বাবা এখন বাড়িতে নেই।

—তাহলে....আচ্ছা · তাহ'লে আর একদিন আসবো।

চলে যাবার জন্য তৈরী হয় যুবক ভদ্রলোক। দেখতে পায় যূথিকা, ভদ্রলোকের হাতে ছোট একটা খাতা আর রসিদ-বইয়ের মত দেখতে একটা বই।

—আপনি নিশ্চয় কোন দরকারী কাজে এসেছিলেন ? প্রশ্ন করে যূথিকা।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তাহ'লে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন না কেন ? বাবা বড় জোর আর আধ ঘণ্টার মধ্যে এসে পড়বেন।

যুবক ভদ্রলোক বেশ খুশি হয়ে, এবং যেন একটু কৃতার্থ ভাবে বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ, আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে আমার কোন অসুবিধা নেই।

—তাহলে বসুন।

যুবক ভদ্রলোক আবার চেয়ারে বসে; কিন্তু যূথিকা ঘোষ চলে যায় না। বরং, অদ্ভুত এক কৌতূহলের আবেগে বাচাল হয়ে ওঠে।—কিছু মনে করবেন না, যদি একটা প্রশ্ন করি।

—বলুন।

—বাবার কাছে আপনার কিসের কাজ?

—চাঁদা চাইতে এসেছি।

—কিসের চাঁদা?

—রিলিফের কাজের জন্য।

যূথিকা বোকার মত তাকায়।—তার মানে?

যুবক ভদ্রলোক বলে— বাংলা দেশে একটা বন্যা হয়ে গিয়েছে। প্রায় দু' লাখ মানুষের ঘর ভেসে গিয়েছে। ক্ষেতের সব ধান পচে গিয়েছে। খবরের কাগজে দেখেছেন বোধহয়…।

যূথিকা—খবরের কাগজ আমি পড়ি না।

—যাই হোক, দেশের সব বড়-বড় নেতা সাহায্যের জন্য আবেদন করেছেন। একটা রিলিফ কমিটিও হয়েছে।

—ঠিক বুঝলাম না।

—বন্যার জন্যে যে-সব লোক কষ্টে পড়েছে তাদের সাহায্য করবার জন্য রিলিফ কমিটিকে অনেকেই টাকা পাঠাচ্ছেন। আমরাও ঠিক করেছি, চাঁদা করে আমাদের গিরিডি থেকে অন্তত শ' পাঁচেক টাকা রিলিফ কমিটিকে পাঠাবো।

—আপনারা কারা?

—আমরা এখানেই চাকরি-বাকরি করি।

—তাই বলুন। হাঁপ ছাড়ে যূথিকা ঘোষ। এতক্ষণ ধরে ভদ্রলোকের কথাগুলিকে একটা রহস্যের মত মনে হচ্ছিল, এবং কিছু বুঝতে পারা যাচ্ছিল না।

বারকয়েক এদিকে-ওদিকে পায়চারি করে, আর গলার শিথিল মাফলার ভাল করে জড়িয়ে, আবার আচমকা প্রশ্ন করে উঠে যূথিকা—কত টাকা পেলে আপনি খুশি হবেন?

যুবক ভদ্রলোক হেসে ফেলে—আপনারা খুশি হয়ে যা দেবেন, তাতেই খুশি হব।

যূথিকা—দশ টাকা?

—হ্যাঁ।

—বেশ; তাহলে···

যূথিকার কথা শেষ না হতেই উদাসীনের ফটকের কাছে মোটর গাড়ির হেডলাইটের আলো দেখা যায়। বেড়িয়ে ফিরেছেন চারু ঘোষ আর কুসুম ঘোষ, এবং বীরু ও নীরু।

বীরু-নীরু দৌড়তে দৌড়তে ছুটে এসেই বাড়ির ভিতর চলে যায়। এবং চারু ঘোষ ও কুসুম ঘোষ আস্তে আস্তে হেঁটে বারান্দার উপরে উঠেই চমকে ওঠেন।

যুবক ভদ্রলোকও ব্যস্তভাবে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায়।—আপনারই কাছে এসেছি।

—হেতু? চারু ঘোষের গলার স্বর একটা গম্ভীর বিরক্তির শব্দের মত বেজে উঠে।

—আপনি নিশ্চয় জানেন বাংলা দেশে যে বন্যা হয়েছে···

—জানি, কিন্তু সেকথা জানাবার জন্য তোমার এখানে আসবার কি দরকার বুঝতে পারছি না।

—রিলিফ কমিটিতে কিছু টাকা পাঠাতে হবে। সেইজন্য আপনার কাছে কিছু চাঁদা চাই।

—নো চাঁদা। দেয়ার ইউ স্টপ।

—আজ্ঞে ?

—আমি চাঁদা দেব না।

—যে আজ্ঞে। আমি চলে যাচ্ছি।

যুবক ভদ্রলোক তখনি চলে যেত নিশ্চয় ; কিন্তু যুথিকা হঠাৎ বলে ওঠে।—আমি যে ভদ্রলোককে কথা দিয়ে ফেলেছি বাবা।

যুথিকার মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে চারু ঘোষের চোখ দুটো যেন চমকে ওঠে।—কি কথা ?

যুথিকা—দশ টাকা চাঁদা প্রমিস করেছি। সেই জন্য উনি অনেকক্ষণ ধরে এখানে বসে আছেন।

—কতক্ষণ ধরে ?

—আধ ঘণ্টা হবে ?

চুপ করে কিছুক্ষণ ধরে আনমনার মত কি যেন ভাবেন চারু ঘোষ। তারপর কুসুম ঘোষের হতভম্ব মুখটার দিকে তাকান। ছোট একটা ভ্রূকুটির ছায়াও চারু ঘোষের চোখের উপর সিরসির করে কাঁপে। তারপরেই পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে যুবক ভদ্রলোকের হাতের দিকে এগিয়ে দেন চারু ঘোষ।

তাড়াতাড়ি পেন্সিল চালিয়ে খস খস করে একটা রসিদ লিখে চারু ঘোষের হাতের উপর ফেলে দিয়ে, আর দশ টাকার নোটটা হাতে নিয়ে চলে যায় যুবক ভদ্রলোক। দেখলে মনে হয়, হ্যাঁ, লোকটা এই প্রকাণ্ড উদাসীনকে অপমান করবার আনন্দে তৃপ্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে পালিয়ে যাচ্ছে।

কুসুম বলেন—এ কি কাণ্ড যুথি ? আবার এরকমের একটা নোংরা কাণ্ড কেন করলে তুমি ?

যুথিকা হাসে—রাগ করছো কেন ?

কুসুম চেঁচিয়ে ওঠেন—তোমাকে চড় মারা উচিত ছিল।

কোথাকার কে না কে, যেমন চেহারা তেমনি আক্কেল, তাকে ইচ্ছে করে তুমি এই বাড়ির চেয়ারে আধ ঘণ্টা ধরে বসিয়ে রেখেছো ?

চারু ঘোষের গম্ভীর স্বর আরও তপ্ত হয়ে ওঠে।—আমার প্রশ্ন, তুমি লোকটার সঙ্গে কথা বললে কেন ?

কুসুম—তোমার জন্যে যে ওকে আজ একটা বাজে লোকের কাছে অপমানিত হতে হলো, এটুকু বুঝতে পারলে কি মুখ্যু মেয়ে ?

যূথিকা ফ্যালফ্যাল করে তাকায়—অপমানিত ?

কুসুম—হ্যাঁ। তুমি লোকটাকে চাঁদা প্রমিস করে বসে আছ বলেই না উনি বাধ্য হয়ে,···ছি ছি, লোকটা এখন বোধহয় মুখ টিপে হাসছে।

চারু ঘোষ—আমাকে জীবনে কোনদিন আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এরকম বাজে কাজ করতে হয়নি। দশ টাকা গেল, টাকা কোন কথা নয়। কথা হলো, আমার প্রিন্সিপ্‌ল্‌ নষ্ট করতে হলো। চ্যারিটি করে পৃথিবীতে ভিখিরীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা আমার নীতি নয়।

কুসুম—সে যাই হোক্, কিন্তু তোমার মেয়ের মনের চাল-চলন ভিখিরী-ভিখিরী হয়ে যাবে কেন ? বাজে লোকের সঙ্গে আধঘণ্টা ধরে কথা বলতে ওর প্রেস্টিজে বাধে না কেন ?

চারুবাবু এইবার একটু শান্তস্বরে উপদেশ দেন।—আশা করি, অপরিচিত কোন লোকের সঙ্গে কোনদিন বেশি কথা বলবে না যূথিকা। ভদ্রতা করতে হবে না, অভদ্রতাও করতে হবে না। শুধু একটি কথায় হ্যাঁ বা না বলে বিদায় করে দেবে।

যূথিকার মুখটাকে অনুতপ্তের মুখের মত একটা করুণ মুখ বলে মনে হয়। বোধহয় ভুল বুঝতে পেরেছে যূথিকা ; আর উদাসীনের

বাপ-মা'কে এভাবে বিব্রত ও বিরক্ত ক'রে মনে মনে একটু লজ্জিতও হয়েছে। যুথিকা বলে—আচ্ছা! উদাসীনের বাপ-মা'র উপদেশ স্বীকার করে নিয়ে কাশতে থাকে যুথিকা।

কুসুমের চোখের দৃষ্টি এইবার একটু মায়াময় হয়ে ওঠে।—ছিঃ, দেখ তো, ঠাণ্ডা লাগিয়ে কাশিটাকে আবার বাড়িয়ে তুললি। ···যা বলি, তোর ভালর জন্যেই বলি।

এই ঘটনারই মাত্র পাঁচটা দিন পরের একটি ঘটনা। সেদিন যুথিকা ঘোষের গলাতে কাশির খক্-খক্ শব্দের উপদ্রব ছিল না।

ঠিক আজকেরই মত সেদিনও উদাসীনের বাপ-মা আর বীরু-নীরু বাড়িতে ছিল না। কিন্তু বেলাটা সন্ধ্যা নয়, সকাল। বই হাতে নিয়ে ফিজিক্সের ফরমুলা মুখস্থ করতে করতে যখন নীচের তলাতেই বাড়ির বাইরের বারান্দায় পাইচারি করছিল যুথিকা ঘোষ, তখন একজন অপরিচিত ব্যক্তি উদাসীনের ফটক পার হয়ে বারান্দার দিকে এগিয়ে আসতে থাকেন।

আরও দেখতে পেয়েছে যুথিকা, ভদ্রলোক মোটর গাড়িতে এসেছেন। ফটকের সামনে রাস্তার উপরেই গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে।

মোটর গাড়ির সম্পর্কে যুথিকা ঘোষের মনেও বেশ একটা শখের কৌতূহল আর গবেষণা আছে। এ ব্যাপারে বীরু-নীরুর উৎসাহও যুথিকার উৎসাহের কাছে হার মেনে যায়। বীরু আর নীরু এক নিঃশ্বাসে যতগুলি গাড়ির নাম বলতে পারে; যুথিকা তার তিনগুণ বলে দেয়। ম্যাগাজিনের পাতা উল্টিয়ে নতুন ডিজাইনের গয়নার বিজ্ঞাপনী ছবির তুলনায় নতুন মডেলের গাড়ির বিজ্ঞাপনীর ছবি দেখতে বেশি ভালবাসে যুথিকা। বীরু আর নীরুও মাঝে মাঝে দিদির জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে আশ্চর্য হয়ে যায়। কলিয়ারির সাহেব মক্কেলদের গাড়ি এসে যখন ফটকের

কাছে থামে, তখন উপরতলার ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে, আগন্তুক গাড়ির দিকে মাত্র একবার তাকিয়ে বলে দিতে পারে যূথিকা—ওটা নিশ্চয়ই নাইনটিন ফিফ্‌টি মডেলের বুইক্‌।

বীরু নীরু ছুটে যায়; এবং ফটকের কাছে গিয়ে গাড়িটাকে দেখে নিয়ে আর ফিরে এসেই আশ্চর্য হয়ে বলে—হ্যাঁ, তুমি ঠিক ধরেছ দিদি!

আগন্তুক ভদ্রলোকের গাড়িটা দেখে যূথিকার চোখে একটা নতুন রহস্যের মত বোধহয়। একেবারে অপরিচিত; কবেকার মডেল কে জানে? চকচকে ঝকঝকে গাড়িটা যে খুব দামী গাড়ি, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ভদ্রলোকও বেশ চকচকে ও ঝকঝকে চেহারার মানুষ। দেখা মাত্র নরেনের কথা মনে পড়ে যায়। ভদ্রলোককে নরেনেরই সমান বয়সের মানুষ বলে মনে হয়। সিল্কের শার্ট আর ট্রাউজার; গলার টাই-ও সিল্কের। ভদ্রলোক যেন নরেনেরই মত, কিংবা, হতে পারে, নরেনের চেয়েও বেশি ঝকঝকে গৌরবের মানুষ।

বারান্দার উপরে উঠেই যূথিকার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে আর প্রীতিপূর্ণ উৎসাহের দৃষ্টি তুলে আগন্তুক ভদ্রলোক প্রশ্ন করেন—মিস্টার ঘোষ বাড়িতে আছেন?

যূথিকা—না।

—কখন আসবেন?

যূথিকা—বলতে পারি না।

—তাহ'লে···বলতে বলতে একটা চেয়ারের কাঁধে হাত দেন ভদ্রলোক; আর নিজেরই হাত ঘড়িটার দিকে তাকান।

—আমি তাহ'লে···। বেশ একটু বিড়ম্বিত স্বরে, আর একটু আশ্চর্য হয়ে আবার কথা বলেন আগন্তুক ভদ্রলোক। আর, যূথিকা ঘোষ তার হাতের বই-এর পাতা উলটিয়ে ফরমূলা খুঁজতে থাকে।

—আমি তাহ'লে চলি।

—হ্যাঁ।

ভদ্রলোক বারান্দা থেকে নেমে যাবার আগেই সরে গিয়ে পায়চারি করতে থাকে যূথিকা।

ফটকের কাছে গাড়ির শব্দ বেজে উঠতেই বুঝতে পারে যূথিকা; চলে গেলেন ভদ্রলোক। কিন্তু ফটকের দিকে চোখ পড়তেই বুঝতে পারে যূথিকা, না, ভদ্রলোকের ঝকঝকে গাড়িটা স্টার্ট নেয়নি। বাড়ির গাড়িটা এসে দাঁড়িয়েছে। বাড়ি ফিরেছেন বাবা আর মা। আর বীরু-নীরু। এবং আগন্তুক ভদ্রলোকের সঙ্গে সবারই একেবারে মুখোমুখি দেখাও হয়ে গিয়েছে।

শুধু কি দেখা? যূথিকা ঘোষের চোখ দুটো একটু আশ্চর্য হয়ে, আর বেশ একটু ভয়ে-ভয়ে বোকার মত তাকিয়ে দেখতে থাকে, বাবা আর মা যেন আগন্তুক ভদ্রলোকের পথ আটক করেছেন। ভদ্রলোককে এখনি চলে যেতে দিতে রাজি নন বাবা আর মা; তবে কি, সত্যিই কি ভদ্রলোক বাবা আর মা'র পরিচিত কোন মানুষ?

কোন সন্দেহ নেই। বারান্দাতে দাঁড়িয়েই শুনতে পায় যূথিকা, ভদ্রলোককে মাত্র পাঁচটি মিনিট বসে যেতে আর অন্তত একটি কাপ চা খেয়ে যেতে কি কাতর অনুরোধ করছেন বাবা আর মা!

কিন্তু ভদ্রলোকের এক কথা।—না; এক্সকিউজ মি!

ভদ্রলোকের গলার স্বর যেন একটা ব্যথিত অহংকারের সৌজন্যপূর্ণ গর্জন।

কুসুম ঘোষ অনুরোধ করেন—মাত্র পাঁচটা মিনিট বসে যাও সুমন্ত।

সুমন্ত? নামটা যেন বাবা আর মা'র মুখেই কয়েকবার শুনেছে যূথিকা ঘোষ। অনেকদিন আগে প্রায়ই এই নামটা বাবা আর মা'র

মুখে শোনা যেত ; আজকাল আর শোনা যায় না। ঐ ভদ্রলোক সেই সুমন্ত ? বাবার এক ব্যারিস্টার বন্ধুর ভাই-পো যে সুমন্ত জার্মানী থেকে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে দেশে ফিরেছে আর মধ্যপ্রদেশে একটা মস্ত বড় কারখানার জেনারেল ম্যানেজার হয়েছে, যাকে অনেক দিন আগে একবার গিরিডিতে আসবার জন্য আর উদাসীনে এসে অন্তত সাতটি দিন থেকে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন বাবা, ঐ ভদ্রলোক কি সেই সুমন্ত ? তাই তো মনে হয়।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুমন্তের জেদই জয়ী হলো। চারু ঘোষ আর কুসুম ঘোষের কাতর অনুনয়গুলি একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল।

—আমার পাঁচ মিনিটেরও দাম আছে মিসেস ঘোষ। অকারণে আর অযথাস্থানে এক মিনিট সময়ও নষ্ট করতে পারি না। বলতে বলতে নিজের গাড়িতে উঠেই গাড়ি স্টার্ট করে সুমন্ত। উদাসীনের বারান্দা, উদাসীনের ফটক, আর উদাসীনের বাপ-মা'র দুটো দুঃখকাতর মুখের দিকে একটা ভ্রূক্ষেপও না করে উধাও হয়ে গেল সুমন্ত।

বিমর্ষভাবে আর ফিসফিস করে আক্ষেপের স্বরে, বোধহয় সুমন্তর এই অদ্ভুত রকমের রূঢ় ব্যবহারের কথা আলোচনা করতে করতে বারন্দার উপরে এসে দাঁড়ান চারু ঘোষ আর কুসুম ঘোষ। এবং যূথিকাকে দেখতে পেয়েই যেন একটা ভয়ানক বিস্ময়ের চমক লেগে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে কুসুমের চোখের চাহনি।

—সুমন্ত যে চলে গেল, তুই কি দেখতে পাসনি যূথি ?

—পেয়েছি বৈকি।

—কোথায় ছিলি তুই ?

—এখানেই।

—তবে কি সুমন্তের সঙ্গে তুই কোন কথাই বলিসনি ?

—হ্যাঁ বলেছি ; সামান্য দু'একটা কথা।

—তার মানে? সুমন্তের সঙ্গে সামান্য দু'একটা কথা কেন?

চারুবাবু বলেন—সুমন্তকে একটু বসে চা খেয়ে যাবার জন্য তুমি অনুরোধ করনি

যূথিকা—না।

চারুবাবু—কেন?

যূথিকা—কি আশ্চর্য, আমি কি করে জানবো যে উনি সুমন্ত শ্রীমন্ত? একজন অপরিচিত ভদ্রলোককে গায়ে পড়ে চা খাওয়াবার জন্য অনুরোধ করতে গিয়ে শেষে কি···।

চারুবাবু—থাক, আর বলতে হবে না। তোমার চমৎকার কাণ্ডজ্ঞানের আর একটা প্রমাণ পাওয়া গেল।

কুসুম চেঁচিয়ে ওঠেন—ছি ছি ছি! এরকম অভদ্রতা তোর পক্ষে সম্ভব হলো কেমন করে বল শুনি? সুমন্ত যে নরেনের মাইনের চারগুণ মাইনে পায়। সুমন্তের তুলনায় নরেন তো বলতে গেলে একজন পেটি অফিসার মাত্র।···সুমন্তের সঙ্গে অভদ্রতা করে নিজেরই যে কি ক্ষতি করলি, তা যদি বুঝতে পারতিস তবে···।

যূথিকা—তোমরা যা খুশি বলতে পার; কিন্তু আমি কোন অভদ্রতা করিনি, ভদ্রতাও করিনি।

—তোমার কপাল করেছ! ধমক দেন কুসুম।

—আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। কুসুমের ক্ষোভ শান্ত করতে চেষ্টা করেন চারু ঘোষ।

উদাসীনের বাপ আর মা যখন নীরব হয়ে ঘরের ভিতরে চলে যান, তারও অনেকক্ষণ পরে, অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবার পর বই-এর পাতা হাতড়ে ফরমূলা খুঁজতে গিয়ে আনমনা হয়ে যায় যূথিকা।

যূথিকার অভদ্রতায় রাগ করে চলে গিয়েছে সুমন্ত; কিন্তু

নরেন যদি আজ আড়ালে দাঁড়িয়ে চারু ঘোষ আর কুসুম ঘোষের এই সব কথা শুনতে পেত, তবে কি হতো? নরেনও কি রাগ করে চলে যেতো না?

বেশ হতো! যূথিকা ঘোষের মনটা যেন হঠাৎ কঠোর হয়ে নীরবে হেসে ওঠে। সব লেঠা চুকে যেত। মামীর কাছ থেকে এক একটা উদ্বেগের চিঠি তেড়ে আসতো না; আর যূথিকার পাটনা যাবার সব ব্যস্ততারও ইতি হয়ে যেত। তখন দেখা যেত, যূথিকার কাছে এসে নিজেদেরই ভুলের কোন কৈফিয়ৎ দিতেন চারু ঘোষ আর কুসুম ঘোষ?

সন্ধ্যাবেলা বেড়াতে এলেন গণেশবাবুর স্ত্রী অর্থাৎ লতিকার মা অর্থাৎ রমা মাসিমা। বসতে না বললেও বসে পরেন, প্রশ্ন না করলেও কথা বলেন, আর গায়ে পড়ে হাজার কথা বলে মানুষকে জ্বালাতে পারেন যে মহিলা, তাঁকে দেখা মাত্র কুসুম ঘোষের মুখ অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। তা ছাড়া ভুলতে পারবেন কি করে কুসুম, ইনিই তো সেই প্রচণ্ড মতলবের আর কৌশলের মহিলা, যিনি নরেনের কাছে লতিকাকে গছাবার জন্য বছরে পাঁচবার পাটনা দৌড়চ্ছেন। ভাগ্য ভাল, যূথিকার মামী কণিকার মত শক্ত মানুষ পাটনাতেই থাকে; তাই নরেনকে টেনে নেবার অনেক চেষ্টা করেও আজ পর্যন্ত টেনে নিতে পারেন নি। কণিকা বাধা দেয় বলেই পারেন নি। তা না হলে এতদিনে বোধহয় নরেনের সঙ্গে লতিকার বিয়ে হয়েই যেত।

কিন্তু লতিকার মা এসেই হেসে হেসে সবার সামনে যে গল্পটা বললেন, সেটা একটা দুঃসহ বিস্ময়ের গল্প। শুনে বিশ্বাস করতেই ইচ্ছা হয় না। লতিকার মা যেন উদাসীনের আকাঙ্ক্ষার সব

গর্ব মিথ্যে করে দিয়ে বিজয়িনীর মত ভঙ্গী নিয়ে একটা কৃতার্থতার কাহিনী বলছেন। যূথিকা সামনেই বসে রয়েছে; তবু বলতে একটুও কুণ্ঠা বোধ করলেন না লতিকার মা।

লতিকার মা বললেন—আমি আজই পাটনা থেকে এসেছি। খবর নিয়েছি, কণিকা ওর ছেলেপিলে নিয়ে ভালই আছে।·· হ্যাঁ, বোম্বাই থেকে হঠাৎ একদিনের জন্য পাটনাতে এসেছিল নরেন। নিজেই ফোন করে শীতাংশুকে জানিয়ে দিল, আমি এসেছি শীতাংশু-দা। জানই তো, আমার শীতাংশুর অভ্যাস. মানুষকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে কত ভালবাসে শীতাংশু!

কোন প্রশ্ন করবেন না বলে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে বসেছিলেন যিনি, তিনিই, সেই কুসুম ঘোষই চমকে উঠে প্রশ্ন করে বসলেন।—শীতাংশু শেষ পর্যন্ত গায়ে পড়ে নরেনকে নিমন্ত্রণ করেছিল বোধহয়?

—হ্যাঁ; দুপুরে এল নরেন; সন্ধ্যা হবার পর চলে গেল। লতিকার গান শুনে কত প্রশংসা করলো নরেন।

কুসুম—গায়ে পড়ে গান শোনালে কে না প্রশংসা করবে বলুন?

লতিকার মা—এটা আবার কেমন কথা হলো। গায়ে পড়ে গান শোনাবে কেন লতি? নরেন নিজেই বারবার বললে, অগত্যা বাধ্য হয়ে···। হ্যাঁ, নরেন তোমাদেরও কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। আমি বলেছি, সবাই ভাল আছে।

কুসুম—আবার পাটনাতে কবে আসবে নরেন?

লতিকার মা—তা জানি না। নরেন বললে, মাঝে মাঝে হঠাৎ দু'এক দিনের জন্য চলে আসতে পারে।

লতিকার মা চলে যেতেই যূথিকার মুখের দিকে আতঙ্কিতের মত তাকিয়ে প্রশ্ন করেন কুসুম—এসব কি শুনলাম?

যূথিকা হাসে—যা শুনতে পেলে তাই শুনলে; আবার কি?

কুসুম—আমার মনে হয়; সব মিথ্যে কথা।

যূথিকা—সত্যি কথা হলেই বা কি?

কুসুম রাগ করেন—বাজে কথা বলিস না।···কিন্তু আমি ভাবছি; কণিকা বসে বসে করছে কি? এরকম একটা কাণ্ড হয়ে গেল, অথচ তার কোন খবরই রাখে না কণিকা? হইতেই পারে না।

লতিকার মা'র কথাগুলিকে অবিশ্বাস করতেই ইচ্ছে করে; কিন্তু অবিশ্বাস করবার মত মনের জোরটাই যেন বার বার দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। তাই ভাবতে গিয়ে এক-একবার সত্যিই শিউরে ওঠেন কুসুম ঘোষ; ভগবান না করেন, লতিকার মা'র কথাগুলি যদি মিথ্যে কথা না হয়, তবে যূথিকার জীবনে যে একটা ভয়ানক অপমানের জ্বালা লাগবে। মেয়েটার মনের দশাও যে কি হয়ে যাবে, ভগবান জানেন! জানেন কুসুম ঘোষ, কণিকার কাছ থেকে অনেক চিঠিতে যে-খবর এতদিন ধরে জেনে এসেছেন, তাতে আর কোন সন্দেহই নেই যে, নরেনকে ভালবাসে যূথিকা। নরেনের ভালবাসার উপরেও মস্ত বড় একটা বিশ্বাস নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে যূথিকা। এর পর, লতিকার সঙ্গে সত্যিই যদি নরেনের বিয়ে হয়ে যায়, তবে···।

কুসুম ঘোষের চোখ দুটো করুণ হয়ে যূথিকার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু এ কি ব্যাপার? যূথিকার মুখে কোন উদ্বেগের বেদনা ফুটে উঠেছে বলে মনে হয় না। ঘরের ভিতরে কেমন স্বচ্ছন্দে ঘুরে ফিরে আর গুন্‌গুন্ করে চাপা-গলায় গান গাইছে যূথিকা।

কণিকার অসাবধানতার উপর রাগ হয়; আর যূথিকার এই চাপা-গলার গানের গুঞ্জনের উপরেও রাগ করেন কুসুম ঘোষ। এরা ভেবেছে কি! কণিকা কি ক্লান্ত হয়ে সব চেষ্টাই ছেড়ে দিল? আর যূথিকা কি আচমকা একটা শক পেয়ে; একেবারে আশাশূন্য হয়ে, দুর্ভাগ্যের আর অপমানের জ্বালা চাপবার জন্য চাপা-গলায় গান গেয়ে উঠলো?

—যুথি। ডাকতে গিয়ে কুসুম ঘোষের গলার স্বরটা যেন দুশ্চিন্তার প্রতিধ্বনির মত বেজে ওঠে।

—কি মা? গান থামিয়ে, আর একটু আশ্চর্য হয়ে উত্তর দেয় যুথিকা।

—তুই ভাবিস না। লতিকার মা নিশ্চয় মিথ্যে কথা বলেছে।

হেসে ওঠে যুথিকা।—বললাম যে, সত্যি হলেই বা কি আসে যায়?

—ছিঃ, ওকথা বলতে নেই। বলবার কোন দরকারও হয় না। লতিকার মা'র মতলব শেষ পর্যন্ত আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু তবু একটু সাবধান হওয়া ভাল।

—বুঝতে পারছি না মা।

—আমার মনে হয়; তোর এখন পাটনাতে থাকাই ভাল।

—এখন পাটনাতে গিয়ে লাভ কি? কলেজ খুলতে এখনও অনেকদিন বাকি আছে।

—তা জানি; কিন্তু নরেনের যে হঠাৎ মাঝে মাঝে পাটনাতে এসে পড়বার সম্ভাবনাও আছে।

—আসুক না।

—কি ছাই বলছিস? তুই এখানে বোবা হয়ে পড়ে থাকবি, কণিকা ওদিকে হাবা হয়ে পড়ে থাকবে; আর শীতাংশু ডাক্তার বার বার নরেনকে নেমন্তন্ন করে চা খাইয়ে, লতিকার গান শুনিয়ে ...ছিঃ ছিঃ...ওরা যে নরেনের একটা ভয়ানক ক্ষতি করে দেবে।

—কিন্তু আমি কি করতে পারি বল?

—তুমি কালই পাটনাতে চলে যাও; তারপর যা করবার কণিকা করবে।

—আমি এখন পাটনা যেতে পারবো না।

যুথিকার কথা শুনে আশ্চর্য হন কুসুম ঘোষ। এবং একটু

শঙ্কিতও হয়ে ওঠেন। যূথিকার চোখ-মুখের এই অবিচল প্রশান্তি, পাটনার উপর হঠাৎ এই তুচ্ছতা, এ যে যূথিকার মনের একটা অভিমানের বিদ্রোহ। খুবই ব্যথিত হয়েছে যূথিকা। মেয়েটার সম্মানে লেগেছে।

চলে যান কুসুম ঘোষ; এবং একটু পরেই ফিরে আসেন; সঙ্গে চারুবাবুও আছেন। যূথিকা ঘোষ ততক্ষণে একটা নতুন উপন্যাসের কুড়ি পাতা পড়ে ফেলেছে।

চারুবাবু বলেন—তোমার এখন পাটনা যাওয়া খুবই দরকার যূথি।

যূথিকার চোখে ছোট অথচ শক্ত একটা আপত্তির ভ্রূকুটি ফুটে ওঠে।

চারুবাবু বলেন—দেরি করবারও দরকার নেই। ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি; কাল সকালে হিমু নামে সেই লোকটাকে একটা খবর দিয়ে আসবে।...

যূথিকা ঘোষের ভ্রূকুটিই যেন হঠাৎ একটা চমক লেগে গলে যায় আর স্নুস্মিত বিস্ময়ের মত উথলে ওঠে। খোলা উপন্যাস বন্ধ করে টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে যেন ছটফট করে উঠে দাঁড়ায় যূথিকা—কালই রওনা হতে বলছো?

চারুবাবু—হ্যাঁ। সকাল দশটার ট্রেনে।

যূথিকা—বেশ।

পাটনা যেতে হবে। আবার জগদীশপুর.. মধুপুর...যশিডি—ট্রেনটা যেন দু'পাশের মত ছোট ছোট স্বপ্নলোকের কলরব কুড়িয়ে নিয়ে হুহু করে ছুটে চলে যাবে। ট্রেনের কামরার অচেনা ভিড়ের মুখরতা যেন একটা নীরবতা; চুপ করে বসে শুধু নিজের

মনের কথাগুলিকে বুকের ভিতরে শুনতে পাওয়া যায়। অচেনা ভিড়টাও যেন একটা নির্জনতা; মনের কথা মুখ খুলে বলে ফেলতে একটুও অসুবিধা নেই, কোন বাধাও নেই; কেউ শুনতেই পায় না বোধহয়। ট্রেণের ঘুম একটা জাগার স্বপ্ন, আর জেগে থাকাও একটা ঘুম-ঘুম আবেশ।

উদাসীনের বাগানে সকালবেলার আলো ছড়িয়ে পড়তেই উদাসীনের মেয়ে যূথিকা ঘোষের মনের ভিতরেও যেন আলো ছড়িয়ে পড়ে। যূথিকা ঘোষের জীবনের গন্তব্যটা পাটনা বটে; সেই পাটনা; যে পাটনাকে বেশ ভাল লাগে। কিন্তু পাটনা যাওয়ার ঝঞ্ঝাটও যে একটা উৎসবের আনন্দ হয়ে যূথিকা ঘোষের কল্পনায় দুলতে শুরু করে দিয়েছে। সকাল দশটা হতে আর বেশি দেরি নেই; তৈরী হয় যূথিকা ঘোষ।

তৈরী হওয়াও এমন কিছু ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার নয়। এবং তৈরী হবার ব্যাপারটাও সকাল ন'টা হতে না হতেই চুকে যায়। চামড়ার বড় একটা কেস, ছোট একটা বেডিং, খাবারের বাস্কেট জলের ফ্লাস্ক আর ছোট হাত-ব্যাগটা। উপরতলার ঘরে থেকে নামিয়ে নিয়ে এসে নীচের তলার বারান্দায় রেখে দেয় চাকর জানকীরাম।

সাজ করবারও বিশেষ কোন ঝঞ্ঝাট নেই। নেকলেসটা গলা থেকে খুলে পড়ে যাবার ভয় আছে; না পরাই ভাল।

নেকলেসটাকে হাত-ব্যাগের ভিতরে রেখে দিয়েছে যূথিকা। আর,···হ্যাঁ···ভেলভেটের স্যাণ্ডেল পায়ে না দেওয়াই ভাল; ট্রেনে ওঠা-নামা করবার হুড়োহুড়ির মধ্যে স্যাণ্ডেলটা পা থেকে খসে পড়ে যায়; আর বেচারা হিমাদ্রি সেই স্যাণ্ডেল আনতে গিয়ে···। ছিঃ, এক পাটি জুতো কুড়িয়ে আনবার জন্য মানুষও এমন বিপদের ঝুঁকি নেয়? চলন্ত ট্রেন থেকে নেমে পড়ে, আর···।

না, লাল ভেলভেটের স্যাণ্ডেল নয়; সবুজ রঙের চামড়ার সেই

মেয়েলী শু জোড়া পায়ে দিয়ে তৈরী হয় যূথিকা। ড্রাইভারও গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে।

যাত্রালগ্নের এই ব্যস্ততার মধ্যেই এক ফাঁকে উপরতলার ঘরের ভিতরে গিয়ে একটু একলা হয়ে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখের ছবিটার দিকে শেষবারের মত তাকিয়ে যেন নিজেকেই একটু মায়া করে নেয় যূথিকা। তারপরেই তরতর করে হেঁটে নীচে নেমে আসে। বাইরের বারান্দার উপর দাঁড়ায়।

চারুবাবু বলেন—দশটা বাজতে আর পনর মিনিট বাকি।

কুসুম ঘোষ বলেন—চল, যুথি।

কিন্তু চলতে গিয়েই হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় যূথিকা। উদাসীনের মেয়ের একটা আশার স্বপ্ন যেন হঠাৎ অন্ধ হয়ে থেমে গিয়েছে।

গা ড়র কাছে দাঁড়িয়ে আছেন বুড়ো বলাইবাবু। বলাইবাবুর এক হাতে তাঁর সেই লাল কম্বলটি, আর এক হাতে সেই ছোট ঝোলাটি ; এবং ঝোলার মুখ ঠেলে সেই ছোট থেলো হুঁকোটার নলের মুখ উঁকি দিয়ে রয়েছে।

চারুবাবু বলেন—হিমু নামে সেই ইয়ে···সেই রাফ স্বভাবের লোকটাকে আর ডাকবার দরকার হলো না। মধুপুর থেকে বলাইবাবু হঠাৎ আজ সকালে এসে গিয়েছেন। কাজেই···।

যূথিকার মুখের হাসি যেন মরা গোলাপের পাপড়ির মত একটা শুকনো বাতাসের আঘাত লেগে ঝরে পড়ে গিয়েছে। বিড়-বিড় করে যূথিকা—তাহলে···তাহলে বলাইবাবু আমার সঙ্গে যাচ্ছেন ?

কুসুম ঘোষ—হ্যাঁ।

চারুবাবু খুশি হয়ে হাসেন—বলাইবাবুর কোমরের বাত যে এত শিগ্‌গির সেরে যাবে, আমিও আশা করতে পারিনি।

হ্যাঁ, দেখতে পায় যূথিকা, গাড়ির কাছে বেশ সোজা হয়ে আর কোমর টান করে দাঁড়িয়ে আছেন বলাইবাবু।

আর দেরী করে লাভ কি? দেরী করবার কোন অর্থও হয় না। আস্তে আস্তে হেঁটে গাড়ির দিকে এগিয়ে যায় যূথিকা।

তারপর আর কোন ঘটনারই কোন দেরি সইতে হয় না। উদাসীনের গাড়ি একটানা ছুটে এসে স্টেশনের কাছে থামে। টিকিট কিনতে দেরি করেন না বলাইবাবু। মধুপুর যাবার ট্রেনের ইঞ্জিনটাও রওনা হবার উল্লাসের শিস বাজাতে আর গুমরে উঠতে দেরি করে না।

চারুবাবু বলেন—টেলিগ্রাম করে কণিকাকে জানিয়ে দিয়েছি।

কুসুম ঘোষ বলেন—তুমিও পাটনা পৌঁছেই একটা চিঠি দিতে ভুলে যেও না যেন।

মাথা নেড়ে একটা সাড়া দিতেও ভুলে যায় যূথিকা। এক-জোড়া উদাস চোখ নিয়ে আর নীরব হয়ে, ট্রেনের কামরার ভিতর ঢুকে অলস মূর্তির মত বসে থাকে। ছেড়ে যায় ট্রেন।

জগদীশপুরের নার্সারি পার হয়ে ট্রেনের ইঞ্জিন তীব্র একটা শিস বাজিয়ে দু'পাশের মাঠের বাতাস শিউরে দিতেই যূথিকা ঘোষের এতক্ষণের নীরবতা যেন হঠাৎ একটা চমক লেগে ভেঙ্গে যায়। বলাইবাবুর দিকে তাকিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে যূথিকা। —আপনার কোমরে বাত হঠাৎ সেরে গেল যে?

বলাইবাবুও চমকে ওঠেন, এবং আস্তে আস্তে হাসেন—হ্যাঁ দিদি, ঠাকুরের কৃপা। ওঃ, এই ক'টা মাস কি যে কষ্ট পেয়েছি, সে আর বলবার নয় দিদি।

যূথিকা—অসুখ হঠাৎ সেরে গেল, ভালই হলো; কিন্তু আজ হঠাৎ আপনার গিরিডিতে যাবার এত দরকার হয়ে পড়লো কেন?

বলাইবাবু—দরকার বিশেষ কিছুর নয় দিদি। বাবুর সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয়নি, তাই···।

যূথিকা—তাই, আর সময় পেলেন না? আজই হঠাৎ··।

বলাইবাবু—কি বললে দিদি ?

যূথিকা—তু'দিন পরেও তো আসতে পারতেন।

বলাইবাবু—তা পারতুম···কিন্তু আজ হঠাৎ গিরিডিতে এসে পড়েছিলুম বলেই না তোমাকে পাটনাতে পৌঁছে দেবার···।

যূথিকা—আমাকে পাটনা পৌঁছে দেবার মানুষ ছিল। আপনি না এলে কোন অসুবিধেই হতো না।

বলাইবাবু—অসুবিধে কেন হবে দিদি ? বাবুর কি চাকর-বাকরের কোন অভাব আছে ? কত মানুষ আছে।

যূথিকার গলার স্বর তপ্ত হয়ে ওঠে—আজ্ঞে না। আপনি না বুঝে-সুঝে এসব কথা বলবেন না।

বলাইবাবু হাসেন—বুড়ো মানুষের কথার এত ভুল ধরতে নেই দিদি।

যূথিকা—সেই জন্যেই তো বলছি।

বলাইবাবু—কি ?

যূথিকা—আপনি বুড়োমানুষ ; ট্রেনে যাওয়া-আসা করবার সামর্থ্যই বা আপনার কতটুকু ? মিছিমিছি নিজে কষ্ট পান, আর আমাকেও অসুবিধায় ফেলেন।

বলাইবাবু ভীতভাবে বলেন—না না, আমার কষ্টের কথা ছেড়ে দাও। তোমার যদি কোন অসুবিধেয় পড়তে হয়, তবে আমাকে বললেই আমি তখুনি···।

যূথিকা—বলতে হবে কেন ?

বলাইবাবু—অ্যাঁ ! না বললে কেমন করে···।

যূথিকা—হ্যাঁ, না বললেও মানুষের অসুবিধে মানুষ বুঝতে পারে।

বলাইবাবু—আমিও কি পারি না ? এতবার তোমাকে পাটনা নিয়ে গেলাম, বলতে পার দিদি, তোমার কোন অসুবিধে হতে দিয়েছি ?

বুড়ো বলাইবাবুর প্রশ্নের একটা স্পষ্ট উত্তর হয় তো ঝোঁকের মাথায় শুনিয়েই দিত যূথিকা ; কিন্তু বলাইবাবু হঠাৎ ব্যস্তভাবে চেঁচিয়ে একটা প্রশ্ন করে ওঠেন।—তোমার হাত-ঘড়িটা দেখে একটু বল তো দিদি, ক'টা বাজলো ? এগারটা বেজে গিয়েছে ?

যূথিকা হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে—হ্যাঁ।

—ওঃ, বড় ভুল হয়ে গেল। বলতে বলতে আরও ব্যস্ত হয়ে ঝোলা হাতরে থার্মোমিটার বের করেন বলাইবাবু ; আর বগলে চেপে বসে থাকেন।

একটু পরেই প্রশ্ন করেন—দেড় মিনিট হলো কি দিদি ?

যূথিকা—হ্যাঁ।

থার্মোমিটারকে যূথিকারই হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে বলাইবাবু বলেন—দেখে একটু বলে দাও তো দিদি, সাতানব্বই না আটানব্বই ?

থার্মোমিটার হাতে তুলে নিয়ে যূথিকা বলে—সাতানব্বই।

যূথিকার হাত থেকে আবার থার্মোমিটার তুলে নিয়ে ঝোলার ভিতরে ভরতে ভরতে বলাইবাবু বলেন—তা হলে ভালই আছি বলতে হবে দিদি। নয় কি ?

যূথিকা—হ্যাঁ।

নীরব হয় যূথিকা। এবং বোধহয় চুপ করে বসে শুধু নিজের মনের সঙ্গে নীরবে কথা বলতে চায়। জানালা দিয়ে বাইরের মাঠের শোভা আর সাঁওতালী গাঁ-এর কুটিরগুলির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ দুটো আনমনা মানুষের চোখের মত অপলক হয়ে থাকে।

কিন্তু আবার বলাইবাবুর একটা প্রশ্নের শব্দ যূথিকার এই আনমনা নীরবতার শান্তিটাকেও চমকে দিয়ে নষ্ট করে দেয়।

—শুনছো দিদি ?

যূথিকা বিরক্ত হয়ে বলে—কি ?

—সাড়ে এগারটা বেজে গিয়েছে কি ?

যূথিকা—হ্যাঁ।

—তা হলে আমার এখন কিছু আহারাদি দরকার দিদি।

যূথিকা আশ্চর্য হয়।—এখুনি খাবেন ?

—হ্যাঁ, নিয়মভঙ্গ করতে চাই না দিদি। ডাক্তার বলেছেন, দিবাভাগের আহার সারতে যেন কোনমতেই বেলা বারটার বেশি না হয়ে যায়।

যূথিকা—মধুপুরে পৌঁছে তারপর খেলেইতো পারতেন।

—না দিদি, মধুপুরে পৌঁছতে ট্রেনটা আজ বড় লেট করবে বলে মনে হচ্ছে।

খাবারের বাস্কেট হাতের কাছে টেনে নিয়ে, অয়েল পেপারের ঠোঙার মধ্যে দশটা লুচি, আলুভাজা, আর পাঁচটা সন্দেশ ভরে দিয়ে বলাইবাবুর হাতের কাছে এগিয়ে দেয় যূথিকা।

বলাইবাবু বলেন—জল ?

বাস্কেটের ভিতর থেকে গেলাস বের করে নিয়ে ফ্লাস্কের জল ঢালে যূথিকা।

বলাইবাবু লুচি-আলুভাজা মুখে দিয়ে চিবোতে চিবোতে বলেন —গিরিডির কুয়োর জল আমার শরীরের পক্ষে একেবারে মেডিসিন। ও জল খেতে পেলে আমি আধ সের মাংসের কারিকেও ডরাই না।

আহারাদি সমাপ্ত হবার পর, ঝোলার হুঁকোর দিকে যখন হাতটাকে মাত্র বাড়িয়ে দিয়েছেন বলাইবাবু, ঠিক তখন ট্রেনের গতি হঠাৎ মৃদু হয়ে যায়। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে যূথিকা বলে—মধুপুর এসে গিয়েছে। এখন আর হুঁকো-টুকো…

বলাইবাবু বলেন—তাতে কি হয়েছে ? স্টেশন আসতে আসতে আমি টিকে ধরিয়ে ফেলবো।

ঝোলা থেকে হুঁকো, কলকে, তামাক আর টিকে বের করেন

বলাইবাবু। এবং দেশলাই জ্বেলে টিকে তাতাতে শুরু করে দেন।

বলাইবাবুর ফুঁ খেয়ে খেয়ে টিকের জ্বলন্ত কোনা থেকে যখন ছোট ছোট স্ফুলিঙ্গ উড়তে থাকে, তখন ট্রেনটা থেমেই যায়। আর, প্ল্যাটফর্মের ভিড়ের কলরব ট্রেনের কামরার ভিতরে এসে লুটিয়ে পড়ে। হুড়োহুড়ি করে কুলির দলও ছুটে আসে।

একটা কুলি কামরার ভিতরে ঢুকে যূথিকা ঘোষের বাক্স বিছানা বাস্কেট আর ফ্লাস্ক নিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ে। শুধু ছোট হাত-ব্যাগটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় যূথিকা।

হুঁকোর নলের মুখে কল্কে চেপে দিয়ে বলাইবাবু বলেন—আমার কম্বলটা আর ঝোলাটাকে ভুলে যেও না দিদি।

একহাতে হুঁকো নিয়ে, আর-এক হাতে দরজার রড ধরে আস্তে আস্তে নেমে যান বলাইবাবু। বলাইবাবুর প্রকাণ্ড কম্বল আর ঝোলাটাকে একহাতে কোনমতে জড়িয়ে ধরে যূথিকাও প্ল্যাটফর্মে নামে।

বলাইবাবু হাঁফ ছাড়েন—আঃ, পাটনা এক্সপ্রেস আসতে এখন অনেক দেরি আছে দিদি।

হ্যাঁ, অনেক দেরি আছে। এখনও আধঘণ্টার বেশি সময় অপেক্ষা করতে হবে, তারপর পাটনা যাবার ট্রেন ছুটে এসে প্ল্যাটফর্মের ওপারে দাঁড়াবে। হৈ-হৈ করে বেজে উঠবে সংসারের একটা ছুটন্ত ভিরের কর্কশ মুখরতা। এবং সেই মুখরতার একটা প্রকোষ্ঠের মধ্যে ঢুকে চুপ করে বসে থাকতে হবে। বিকেল পার হয়ে যাবে, সন্ধ্যাটা আস্তে আস্তে মরে যাবে, আর রাত গভীর হয়ে যাবে। তারপর, মাঝরাতেরও পরে একটি মুহূর্তে পাটনা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নেমে শুধু দেখতে হবে মামীর ড্রাইভার দাঁড়িয়ে আছে।

পাটনা যাবার ট্রেন একটা ট্রেন মাত্র। এমন ট্রেনযাত্রা একটা যন্ত্রণার অভিযান মাত্র। ভাবতে একটুও ভাল লাগে না। যূথিকার কল্পনার ছবিটাকে মিথ্যে করে দিয়ে এ কি অদ্ভুত একটা অমধুর আর অকরুণ ট্রেনযাত্রা দেখা দিল?

হঠাৎ ছটফট করে শঙ্কিতের মত চেঁচিয়ে ওঠে যূথিকা—বলাইবাবু।

—কি দিদি?

যূথিকা—আমার বড় অসুবিধে হচ্ছে। আমি পাটনা যেতে পারবো না।

চমকে ওঠেন বলাইবাবু—অসুবিধে? কিসের অসুবিধে? আমি তো সর্ব্বক্ষণ তোমার সুবিধের জন্য ব্যস্ত হয়ে রয়েছি দিদি।

যূথিকা—তবু আমার অসুবিধে হচ্ছে।

বলাইবাবু—কিন্তু, আমি তো……।

যূথিকা—আপনাকে দোষ দিচ্ছি না। মোট কথা, আমার এখন পাটনা যেতে খুবই খারাপ লাগছে।

চোখ বড় করে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে থাকেন বলাইবাবু—তাহলে …সত্যিই কি গিরিডি ফিরে যেতে চাও?

যূথিকা—হ্যাঁ।

বলাইবাবু—কিন্তু বাবু যে আমার উপর ভয়ানক রাগ করবেন দিদি।

যূথিকা—আপনার ওপর রাগ করবেন কেন? আপনার দোষ কি?

বলাইবাবু—হ্যাঁ, সেটা বুঝে দেখ দিদি। আর সেটা বাবুকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে ভুলে যেও না।

যূথিকা—আপনি ভাবছেন কেন? আমি বলবো, আমিই ইচ্ছে করে ফিরে এসেছি।

যূথিকাই ব্যস্ত হয়ে এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে কুলিটাকে ডাকে। এবং কুলিটাও একটু আশ্চর্য হয়ে বাক্স বেডিং তুলে নিয়ে গিরিডি যাবার ট্রেনের কামরায় তুলে দিয়ে সেলাম জানায়—কুছ বকশিস ভি দিজিয়ে দিদি।

হাত-ব্যাগ থেকে টাকা বের করে কুলির হাতে ফেলে দিয়ে আর বলাইবাবুর দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে যূথিকা।—চা খাওয়ার ইচ্ছে থাকে তো খেয়ে নিন বলাইবাবু। এই ট্রেন ছাড়তেও আর বেশি দেরি নেই।

বলাইবাবু বলেন—নিশ্চয় নিশ্চয়। একটা চা-ওয়ালাকে ডাক দাও দিদি।

জ্বরটর হয়নি, শরীর ভালই আছে, তবু মধুপুর থেকে ফিরতি ট্রেনেই গিরিডি ফিরে এসেছে যূথিকা। একি কাণ্ড! কি বিশ্রী ব্যাপার! কুসুম ঘোষ তাঁর দু'চোখের বিস্ময় সামলাতে গিয়ে শেষে সন্দেহ করেন, মেয়েটার মাথায় সত্যি সত্যি পাগলামির ছিট দেখা দিল না তো?

চারু ঘোষ বলেন—আমি তো যূথির মতিগতির কোন অর্থই খুঁজে পাচ্ছি না।

এখন পাটনা যেতে একটুও ভাল লাগছে না; এই কথা ছাড়া আর কোন কথা বলতে পারেনি যূথিকা। কথাগুলি একটুও মিথ্যে নয়। এবং বিশ্বাসও করেন উদাসীনের পিতা আর মাতা। কিন্তু, কেন পাটনা যেতে একটুও ভাল লাগছে না? এ যে একটা অত্যন্ত অন্যায় ভাল-না-লাগা! অনেকবার আক্ষেপ করেন কুসুম ঘোষ।

কেন পাটনা যেতে ইচ্ছে করছে না? এ যে নিতান্ত বোকার

মত ইচ্ছে না-করা! বারবার এবং বেশ একটু রূঢ় স্বরে অভিযোগ করেন চারু ঘোষ।

এবং মাত্র আর তিনটে দিন পার হবার পর, পাটনা থেকে কণিকা মামীর একটা মস্ত বড় চিঠি এসে উদাসীনের পিতা আর মাতার মনে আবার একটা কঠিন উদ্বেগের বেদনা ছড়িয়ে দেয়।

জানিয়েছে কণিকা; আর তিন-চার দিনের মধ্যে নরেন পাটনাতে এসে পড়বে। এবং এইবার বেশ কিছুদিন পাটনাতেই থাকবে। নরেনের চিঠির ভাষা থেকে বুঝতে পেরেছে কণিকা; এবার পাটনাতে এসে মন স্থির করে একটা পাকা কথা দিয়ে ফেলবে নরেন। নরেনের মা'র সঙ্গেও আলাপ করে তাই মনে হয়েছে কণিকার। তা না হলে দেড় মাসের ছুটি নেবে কেন নরেন?

আরও কতগুলি কথা খুবই বিরক্ত হয়ে লিখেছে কণিকা;— কিন্তু আপনাদের প্রতিবেশী গণেশবাবুর বড় ছেলে, অর্থাৎ লতিকার ডাক্তার দাদা শীতাংশু যে কেন এত ঘন ঘন নরেনের মা'র সঙ্গে দেখা করছে বুঝতে পারছেন কি? মাঝে একদিনের জন্যে আমি সাসারাম গিয়েছিলাম। ফিরে এসে জানলাম, নরেনও একদিনের জন্য পাটনা এসেছিল। যূথিকার সঙ্গে নরেনের ভাবসাব আছে, একথা তো ওরাও জানে। তবু দেখুন, কি কুৎসিত মনোবৃত্তি? নরেনের কাছে লতিকাকে গছাবার জন্য কী চক্রান্তই না ক'রে চলেছে। লতিকার মা, আপনাদেরই প্রতিবেশিনী সেই সাংঘাতিক মহিলাটি, এরই মধ্যে একবার পাটনা ঘুরে গিয়েছেন। নরেনকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে লতিকার গান শুনিয়েছেন। নরেনের মা'র কাছে লতিকার একখানা ফটো আর লতিকার লেখা এক গাদা কবিতার একটা খাতা রেখে গিয়েছেন। কিন্তু ওদের কোন মতলবই সফল হবে না, যদি এইসময় যূথিকা এসে পাটনাতে থাকে।

সব শেষে লিখেছে কণিকা—যূথিকার একটা বিশ্রী দোষ এবার দেখলাম। মেয়েটা কি-যেন সন্দেহ করেছে আর হতাশের মত হাঁপিয়ে পড়েছে। ওরকম ভুল করলে চলবে না যূথিকার। ওকে একটু বুঝিয়ে দেবেন ; নরেন যদি, ভগবান না করেন, কোন কারণে কিছু সন্দেহ ক'রে ফেলে, তবে কি পরিণাম হবে কল্পনা করুন। যদি লতিকার সঙ্গে নরেনের বিয়ে হয়ে যায়, তবে যূথিকার কি আর কারও কাছে মুখ দেখাবার উপায় থাকবে ?

—এই নে, কণিকার চিঠি পড়ে দেখ। কুসুম ঘোষ রাগ করে চিঠিটাকে যূথিকার হাতের কাছে ফেলে দিয়ে যান।

পাটনার মামীর প্রকাণ্ড চিঠিটা পড়েই চমকে ওঠে যূথিকা। যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠেছে যূথিকার প্রাণ। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে যেন আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকে যূথিকা। তারপরেই ছটফট ক'রে ওঠে।

লতিকার মনের আশার ইতরতা দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে যূথিকা। লতিকার জীবনের জেদটাও কী ভয়ানক বেহায়া! তাইতো? কি হবে উপায়? নরেন সত্যিই যদি ভুল করে লতিকার মত মেয়েকে···ভাবতে গিয়ে উদাসীনের মেয়ে যূথিকার মনের ভিতরে একটা অস্বস্তি, বোধহয় একটা উদ্বেগের ছায়া ছটফট করতে থাকে।

নরেনের মনটা যদি এত উদার আর কোমল না হতো তবে এক মুহূর্তের জন্যও উদ্বেগে বিচলিত হতো না যূথিকার মন। কিন্তু নরেন খুব বেশি ভদ্র বলেই বোধহয় শীতাংশু ডাক্তারের ইচ্ছা আর চেষ্টার বিরুদ্ধে স্পষ্ট ক'রে অভদ্রতা করতে পারে না। নইলে কবেই মাত্র একটি স্পষ্ট কথা বলে শীতাংশুদার উৎসাহ থামিয়ে দিতে পারতো নরেন।

বললেই তো পারতো নরেন ; বললো না কেন? আমি যূথিকাকে ভালবাসি, যূথিকা আমাকে ভালবাসে, সুতরাং, আপনি

বৃথা আর লতিকার গান শোনাবার জন্য আমাকে ডাকবেন না; একথাটাও শীতাংশু ডাক্তারকে বলে দিলে এমন কিছু অভদ্রতা হচ্ছো না।

কল্পনা করতে পারে যূথিকা, নরেনের সঙ্গে যূথিকার বিয়ে হয়ে যাবার পর শুধু লতিকা নয়, এই গিরিডির আরও অনেকে যূথিকার ভাগ্যকে হিংসে না করে পারবে না। ত্রিশ বছর বয়সে একহাজার টাকা মাইনের সরকারী সার্ভিস করে যে নরেন, সে নরেনের পক্ষে যূথিকার চেয়ে ঢের ঢের বেশি শিক্ষিতা ও সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করবার অসুবিধা ছিল না। কিন্তু শুধু ভালবাসার সৌভাগ্যে যূথিকা ঘোষই যে নরেনের জীবনের সঙ্গিনী হয়ে যাবে! যদি হিংসে করতে হয়, তবে যূথিকার এই ভালবাসাকেই হিংসে করুক না সবাই।

কিন্তু যূথিকা যদি পাটনা যেতে চায়, তবে নিয়ে যাবে কে? শুনতে পায় যূথিকা, বাবা আর মা বাইরের ঘরে বসে এই সমস্যার কথাও আলোচনা করছেন। বলাইবাবু বাতের ব্যাথায় আবার পঙ্গু হয়ে গিয়ে উদাসীনের ভাবনাগুলিকে সমস্যায় ফেলেছেন।

—যূথি। চেঁচিয়ে ডাক দেন চারুবাবু।

বাইরের ঘরের দরজার কাছে যূথিকা এসে দাঁড়াতেই গম্ভীর-স্বরে আদেশ করেন কুসুম ঘোষ—তোমাকে এখনই, আজ এই সন্ধ্যাতেই পাটনা রওনা হতে হবে।

চারুবাবু—আমি এখনি সেই লোকটাকে খবর পাঠাচ্ছি···কি যেন তার নাম?

হেসে ফেলে যূথিকা—হিমাদ্রিবাবু।

হ্যাঁ, ডাক শুনে চলে আসতে দেরি করেনি হিমু। এবং যূথিকাকে সঙ্গে নিয়ে পাটনা রওনা হয়ে যেতে একবিন্দু আপত্তিও করেনি।

গিরিডির স্টেশনের ভিড় আর হল্লা পিছনে ফেলে রেখে ট্রেনটা যখন আবার রাঙা মাটির মাঠের উপর দিয়ে, দু'পাশের যত সবুজ শোভার ভিতর দিয়ে হু হু ক'রে ছুটে এগিয়ে যেতে থাকে, তখন যূথিকা ঘোষের মুখে যেন একটা প্রাণখোলা হাসির এক ঝলক তরল আভা ছড়িয়ে পড়ে।—হিমাদ্রি যে আমাকে চিনতেই পারছো না।

হিমুও হাসে – তুমি জান, চিনতে পেরেছি কি না।

যূথিকা—তবে এরকম না চেনবার ভঙ্গী ক'রে গম্ভীর হয়ে আছ কেন ?

হিমু—তোমার গম্ভীরতা দেখে।

যূথিকা—আমি গম্ভীর ?

হিমু—হ্যাঁ, এতক্ষণ খুব বেশি গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবছিলে

যূথিকা—হ্যাঁ, সত্যি হিমাদ্রি ; মানুষের ইতরতার রকম দেখে খুবই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি।

হিমু—ওসব কথা ছেড়ে দাও। ওসব কথা যত ভাববে, তত নিজেরই ক্ষতি হবে।

যূথিকা উৎফুল্ল হয়ে বলে—ঠিক কথা বলেছো হিমাদ্রি, এরকম পরামর্শের জন্যেই যে মানুষের একটা বন্ধুমানুষ দরকার।

কিন্তু আবার কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে আনমনার মত চোখ নিয়ে কি-যেন ভাবতে থাকে যূথিকা ঘোষ। মানুষের ইতরতার কথা না হোক, অন্য কোন কথা নিশ্চয় ভাবছ। হিমু প্রশ্ন করে ; এই বোধহয় হিমু নিজের থেকে যেচে, কে জানে কোন্ সাহসের ছোঁয়া পেয়ে, প্রশ্ন করে হিমু—আবার কি ভাবতে আরম্ভ করলে ?

খিল খিল করে হেসে ওঠে যূথিকা।—যা ভাবছিলাম, সেকথা তোমাকে বলা উচিত কিনা, তাই ভাবছি।

— ভেবে দেখ। হিমুও হেসে হেসে জবাব দেয়।

যূথিকা—কলেজ খোলেনি, তবু কেন পাটনা যাচ্ছি বলতে পার ?

হিমু—যদি বলতে পারতাম, তবে বলেই ফেলতাম। তোমার আর জিজ্ঞাসা করবার দরকার হতো না।

যূথিকা—অভিসারে যাচ্ছি।

হিমু মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকায়।

যূথিকা—শুনে লজ্জা পেলে তো হিমাদ্রি ?

হিমু—না। কিন্তু তোমার ইচ্ছেটা এই যে, তোমার কথা শুনে আমি যেন লজ্জা পাই। আসলে কিন্তু নিজে লজ্জা পেয়েছ।

যূথিকা—লজ্জা পাওয়ারই কথা বটে। বোম্বাই থেকে নরেন আর দু'এক দিনের মধ্যে পাটনা পৌঁছে যাবে। নরেন হলো আমার···।

হিমু—কি ?

যূথিকা—আঃ, যেন একেবারে খোকাটি! স্পষ্ট ক'রে না বললে কিছু বুঝতেই পারে না।

হিমু হেসে ফেলে—এসব কথা যে শুধু মেয়ে-বন্ধুর কাছে বলতে হয় যূথিকা।

যূথিকা—তোমার মত পুরুষ-বন্ধু মেয়ে-বন্ধুর চেয়েও বেশি মেয়ে।

হিমু—একরকম প্রশংসা আমাকে আজ পর্যন্ত কেউ করেনি।

যূথিকা—সত্যি হিমাদ্রি, নরেন মানুষটি সত্যি ভালো। তোমার চেয়ে বয়সে একটু বেশিই হবে, তবে ত্রিশের বেশি নয়; কিন্তু এক হাজার টাকা মাইনের সরকারী সার্ভিসে আছে। কথাবার্তায় যদিও বেশ একটু অহঙ্কার আছে, কিন্তু সে অহঙ্কার মানিয়ে যায়। কেন মানাবে না বল ? বেশ বড় অবস্থাপন্ন বাড়ির ছেলে, বেশ শিক্ষিত, তার ওপর চাকরিতেও এরকম ভাল কেরিয়ার। আমার মত মেয়ে ওর চোখেই পড়বার কথা নয়। কিন্তু···।

দুটি শান্ত চোখের দৃষ্টি আরও অলস ক'রে দিয়ে, সুন্দর একটি গল্প শোনবার আনন্দে যেন কৃতার্থ হয়ে বসে থাকে হিমু দত্ত। নস্যির ডিবে ঠুকতেও ভুলে যায়।

যূথিকা—কিন্তু ভালবাসায় সাত খুন মাপ হয়। আমারও সেই সৌভাগ্য হয়েছে হিমাদ্রি। নরেন আমাকে বিয়ে করবার আশায় রয়েছে।

যূথিকার গল্পটা বোধ হয় নিজের থেকেই থামতো না, যদি জগদীশপুরেতে এতগুলি ভদ্রলোক এবং তাঁদের সঙ্গে একটি নববর ও একটি নববধূ এই কামরাতে না উঠতো।

মধুপুরেতে গাড়ি বদল করতে অনেকখানি সময় হুড়োহুড়ি আর ছুটোছুটি করে পার হ'য়ে গেল। পাটনার ট্রেনে উঠে সীটের এক কোণে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে উপন্যাস পড়তে পড়তে অনেক রাত ক'রে দেবার পরও যখন যূথিকার চোখে ঘুমের আবেশ দেখা দিল না, তখন ডাক দেয় যূথিকা—হিমাদ্রি।

সামনের সীট থেকে উঠে এসে হিমাদ্রি বলে—বিছানাটা পেতে দিই?

যূথিকা—হ্যাঁ।

বিছানা পেতে দেয় হিমু।

যূথিকা বলে—নরেন আমার উপর মাঝে মাঝে রাগ করে মনে হয়।

হিমু—তুমি কি এখনও জেগে বসে থাকবে?

যূথিকা—আঃ, হ্যাঁ, তুমিও একটু জেগে থাক না কেন? একটু সরে বসে হিমুকে পাশে বসবার জন্য জায়গা ক'রে দেয় যূথিকা।

হিমুর বসবার রকম দেখে আবার বিরক্ত হয়ে বলে যূথিকা—এ-গল্প চেঁচিয়ে বলা যায় না, এটুকুও বুঝতে পার না কেন? আর একটু কাছে সরে এস।

উপন্যাসটাকে হাতে তুলে নিয়ে হিমাদ্রির কোলের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যূথিকা হেসে ওঠে—এটাতে ধানাই পানাই ক'রে কত কিছুই না বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে! ছাই হয়েছে! ওসবের

চেয়ে অনেক অনেক মিষ্টি ব্যাপার আমার আর নরেনের মধ্যে হয়ে গিয়েছে। নরেনের সঙ্গে একবার আমার তর্ক হয়েছিল, কে বেশি ভালবাসে। আমি জোর করে বলেছিলাম, আমি বেশি ভালবাসি। হেরে গিয়েছিল নরেন, শেষে আমার কথাটাকেই সত্য বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল।

একটা ষ্টেশনে ট্রেনটা থেমেছে। ষ্টেশন অন্ধকার বেশি, আলো কম, এবং মানুষের গলার আওয়াজের চেয়ে ঝিঁঝির ডাকের জোর বেশি। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে যূথিকা বলে—এটা বোধ হয় সেই ষ্টেশন, যেখানে চা আনবার নাম ক'রে তুমি পালিয়ে গিয়েছিলে।

হিমু—তার মানে ?

যূথিকা—আমার তাই মনে হয়েছিল। যাকগে,...নরেন এবার দেড় মাসের ছুটি নিয়েছে কেন বলতে পার ?

—না, এটা সেই ষ্টেশনটা নয়। নস্যির ডিবে ঠুকে এক টিপ নস্যি বার করে হিমু। যূথিকার প্রশ্নের উত্তর দিতে বোধ হয় ভুলে যায়।

যূথিকা বলে—এবার একেবারে তৈরী হয়েই আসছেন বলে মনে হচ্ছে। বিয়ের শাঁখের শব্দ না শুনে আর ছাড়বেন না। মামী চিঠিতে যা লিখেছেন, সেটাই ঠিক। মনে হচ্ছে, এবার সাঙ্গ হলো ধুলোখেলা।

যূথিকার চোখের তারা ঝকঝক করে। এবং দেখে মনে হয়, হ্যাঁ, আর ধুলোখেলা নয়, যূথিকার জীবন এইবার মুক্তোখেলার আশ্বাস পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে। কল্পনায় তারই ছবি দেখছে যূথিকা।

যূথিকা বলে—কে জানে বোম্বাই শহরটা দেখতে কেমন ? যেমনই হোক, নরেনের সঙ্গে যেখানে থাকবো সেখানেই তো আমার স্বর্গ।

বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারা যায়, মাঠ জুড়ে সাদা কাশের বন ছড়িয়ে রয়েছে। খুব জোরে সোঁ সোঁ শব্দ ক'রে ট্রেনটা বাতাস কাটছে। যূথিকা বলে—ক'টা বাজলো হিমাদ্রি? তোমার ঘুম পায়নি?

—তুমি এবার ঘুমিয়ে পড়। বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় হিমাদ্রি, এবং সামনের সীটের উপরে গিয়ে বসে।

পাটনা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে শুধু মামী দাঁড়িয়ে আছেন। যূথিকার চেনা মানুষ বলতে আর কেউ নেই। ট্রেন থেকে নেমে মামীর কাছে এগিয়ে যায় যূথিকা। কুলির মাথায় যূথিকার জিনিসপত্র চাপিয়ে দিয়ে এক দিকে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে হিমাদ্রি।

মামী বলেন—সেই ছেলেটি আবার এসেছে দেখছি।

যূথিকা—হ্যাঁ। বলাইবাবু বাতে পঙ্গু হয়ে রয়েছেন।

মামী—ছেলেটি বোধ হয় কিছু বলতে চায়।

যূথিকা—ও হ্যাঁ।

হিমুর কাছে এগিয়ে এসে যূথিকা হাতের ব্যাগ থেকে টাকা বের করে।

হিমু বলে—টাকা দরকার হবে না।

যূথিকা—তার মানে? তুমি গিরিডি ফিরে যাবে না?

হিমু হাসে—ফিরবো বৈকি; কিন্তু ট্রেনভাড়ার দরকার নেই।

যূথিকা—হেঁয়ালি করো না হিমাদ্রি, স্পষ্ট ক'রে বল।

হিমু—আজই ফিরবো। কথা আছে, এখান থেকে লতিকাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। লতিকার বাবা গণেশবাবু বলে দিয়েছেন, গিরিডি ফিরে যাবার খরচ তিনিই দেবেন।

মামীর কানে হিমুর কথাগুলি পৌঁছেছে। শুনেই প্রসন্ন হয়ে

ওঠে মামীর মুখটা। লতিকা গিরিডি চলে যাচ্ছে, তার মানে পাটনাতে থাকবার সাহস আর হচ্ছে না। বুঝে ফেলেছে শীতাংশু ডাক্তার, নরেনকে নেমন্তন্ন ক'রে লাভ নেই। এতদিনে আক্কেলের উদয় হয়েছে, এবং হার মেনে হতাশ হয়ে নরেনকে উদ্‌ভ্রান্ত করবার সব মতলব ছাড়তে হয়েছে।

কোন সন্দেহ নেই মামীর। নরেন পাটনাতে আসছে জেনেও লতিকা যদি পাটনা থেকে চলে যায়, তবে তার কি অর্থ হতে পারে? হয় নরেন চিঠি দিয়ে, নয় নরেনের মা নিজেই শীতাংশুকে ডেকে নিয়ে, লতিকার ফটো ফিরিয়ে দিয়ে স্পষ্ট ক'রে বলে দিয়েছেন, না, আমাদের রাজি হওয়া সম্ভব নয়।

এত তাড়াতাড়ি এরকম একটা সুসংবাদ শুনতে পাবেন, আশা করতে পারেননি মামী। আগে শুনতে পেলে যূথিকাকে এত তাড়াতাড়ি গিরিডি থেকে পাটনাতে চলে আসবার জন্য চিঠি দিতেন না।

শুনতে পেলেন মামী, ছেলেটিরই মুখের দিকে তাকিয়ে যূথিকা যেন আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করছে—লতিকার এখন গিরিডি যাবার দরকার হলো কেন?

একটা আকাট আহম্মক মেয়ে! কাকে কি জিজ্ঞাসা করতে হয়, তাও বুঝতে শিখলো না, অথচ বয়স তো তেইশ পার হয়ে প্রায় চব্বিশে গিয়ে পৌঁছেছে। এ-কথা এই গোবেচারা ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা ক'রে লাভ কি? তা ছাড়া, এত আশ্চর্যই বা হয় কেন যূথিকা? লতিকা কেন গিরিডি চলে যাচ্ছে, এটুকু আন্দাজ করবার মত বুদ্ধি নেই কি মেয়েটার? খবরটা শুনে ওরই তো এখন সবচেয়ে বেশি হেসে ওঠা উচিত।

কি-যেন বলতে গিয়ে ব্যস্তভাবে যূথিকা আর হিমুর প্রায় কাছাকাছি এগিয়ে যেয়েই থমকে দাঁড়ান মামী। যূথিকার

মুখের দিকে চোখ পড়তেই আশ্চর্য হয়ে যান। এ আবার কি-রকমের কাণ্ড? মেয়েটার চোখ দুটো জ্বলছে যেন; ছেলেটার মুখের দিকে যেন বিষদৃষ্টি হেনে একেবারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যূথিকা। ছেলেটি যেন ভয়ানক একটা বিশ্বাসঘাতক, একটা নিষ্ঠুর অপরাধী; যূথিকার জীবনের একটা সুখস্বপ্নকে যেন আচম্‌কা আঘাত দিয়ে দিয়ে ধুলোর উপর লুটিয়ে মিথ্যে ক'রে দিয়েছে···কি-যেন ঐ ছেলেটির নাম, হ্যাঁ, হিমাদ্রি।

মামীর চোখে একটা সন্দেহের বেদন থমথম করে। কে জানে কি ব্যাপার? যেখানে কোন সমস্যা আশঙ্কা করতে পারেনি কেউ, সেখানে সত্যিই বিশ্রী একটা সমস্যা কঠিন হয়ে ওঠেনি তো? যূথিকার বোকা মনটা কোন ভুল ক'রে ফেলেনি তো? নইলে এত বড় একটা মেয়ের পক্ষে এত বড় একটা ছেলের মুখের ক ওভাবে তাকিয়ে থাকবার আর কি অর্থ হতে পারে?

মামী যে এত কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছে, যেন দেখতেই পাচ্ছে না যূথিকা। হিমুর মুখের দিকে জ্বালাভরা দুটো অপলক চোখ তুলে যূথিকা বলে—তোমার লজ্জা করছে না?

হিমু হয়তো যূথিকার প্রশ্নের উত্তর দিত, কিন্তু মামীকে কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিব্রত বোধ করে হিমু; এবং স্পষ্ট ক'রে উত্তর দিতে পারে না বলেই অস্পষ্ট স্বরের একটা প্রতিবাদ হিমুর ঠোঁটের কাঁপুনিতে শুধু বিড়বিড় করে।

যূথিকা বলে—তুমি এখনি গিরিডি ফিরে যাও হিমাদ্রি। লতিকাকে নিয়ে যেতে পারবে না।

হিমু হাসতে চেষ্টা করে—সে কি কথা? আমি যে গণেশবাবুকে কথা দিয়ে এসেছি।

যূথিকা—কথা দিতে লজ্জা করেনি একটুও?

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন মামী; মামীর কপালের রেখা কুঁচকে ওঠে।

যূথিকা বলে—কি? কথা বলছো না কেন হিমাদ্রি?

হিমু—কি জানতে চাইছো, বল।

যূথিকা—তুমি লতিকাকে গিরিডি নিয়ে যাবে না, আমাকে স্পষ্ট ক'রে কথা দাও।

হিমু—অসম্ভব।

যূথিকা—কি?

হিমু—লতিকাকে গিরিডি নিয়ে যেতেই হবে। মানুষকে কথা দিয়ে মিছিমিছি কথার খেলাপ করতে পারবো না।

প্ল্যাটফর্মের ভিড়; শতশত মানুষের কোলাহলে মুখর হয়ে রয়েছে পৃথিবীর একটা ব্যস্ততা; শুধু চলে যাবার টানে অস্থির ও চঞ্চল একটা সংসারের একটি টুকরো। এখানে থমকে দাঁড়িয়ে থাকবার জন্য কেউ আসে না। কিন্তু চারু ঘোষের মেয়ে যূথিকা ঘোষ সত্যিই যেন চিরকালের মত থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে, এবং সামনে বা পিছনে কোন দিকে এগিয়ে যাবার সাধ্যি নেই।

চেঁচিয়ে ওঠে যূথিকা—তাহলে আমিও গিরিডি ফিরে যাব। আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব।

মামী ডাকেন—যূথিকা?

চমকে ওঠে যূথিকা। আর, মামীকে কাছে দেখতে পেয়েই আতঙ্কিতের মত ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকে, তারপরেই হাসতে চেষ্টা করে।

মামী বলেন—অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছে, কুলিটা বিরক্ত হয়ে উঠেছে। চল এবার।

যূথিকা হাসে—হ্যাঁ, যাবই তো। এখানে চিরকাল দাঁড়িয়ে থাকবো, কে বলেছে?

মামী—তোমার কাজ শেষ হয়েছে তো?

যূথিকা—কাজ? কিসের কাজ?

মামী—ওকে যা বলবার ছিল, বলা হয়েছে?

যূথিকা ভ্রূকুটি করে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে—ওকে আবার কি বলবার ছিল? কিছু না। চল।

পাটনাতে এসেছে নরেন; এবং লতিকা পাটনাতে নেই। সুতরাং যূথিকার মনের ভাবনায় এক ফোঁটা উদ্বেগও নেই। তা ছাড়া, মামীও খোঁজ নিয়ে জেনেছেন, এবার আর শীতাংশু ডাক্তার নরেনকে চা-এর নেমন্তন্ন করবার চেষ্টা করেনি। এবং একথাও সত্যি, নরেনের মা লতিকার ফটো ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন, এবং সেই সঙ্গে যে চিঠিটা দিয়েছেন, তাতে শুধু ফটো ফেরত পাঠালাম ছাড়া আর কোন কথা লেখেননি। শীতাংশু ডাক্তারের পাশের বাড়ির সুব্রতবাবুর স্ত্রী একদিন বেড়াতে এসে মামীকে এই খবরও জানিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।

গর্দানিবাগের মাঠের সেই পলাশে এখন আর ফোটা ফুলের শোভা রক্তময় হয়ে হাসে না। নতুন বর্ষার জলে মাঠের ঘাস সবুজ হয়ে উঠেছে। এই মাঠের সবুজের উপর নরেনের পাশে পাশে হেঁটে প্রায় রোজই সকালে আর সন্ধ্যায় বেড়িয়েছে যূথিকা। নরেনকে আর নিমন্ত্রণ ক'রে ডাকতে হয় না। নিজের প্রাণের আবেগে নরেন নিজেই রোজ এসে যূথিকার কাছে দাঁড়ায়। চা-এর জন্য নিজেই তাগিদ দেয় নরেন। আর মাঝে মাঝে, মামী কিংবা অন্য কেউ কাছে না থাকলে, যূথিকার কানের কাছে নরেনই হেসে হেসে ফিসফিস করে—তোমাকেই কনগ্র্যাচুলেট করতে হয়।

—কেন ?

—তোমার ভালবাসারই জয় হলো।

—তা হলো বৈকি।

—অদ্ভুত !

— কি ?

—তোমার ভালবাসার জেদ।

—হ্যাঁ, অদ্ভুত জেদ বৈকি! চার বছর ধরে বলতে গেলে তপস্যা করতে হয়েছে।

নরেন হাসে—তপস্যার সিদ্ধিও হয়েছে।

নরেনের দু'চোখের গর্বময় উৎফুল্লতার দিকে তাকিয়ে যূথিকা বলে—হ্যাঁ, চার বছর অপেক্ষায় থেকে থেকে তারপর যখন তুমি আমাকেই বিয়ে করতে রাজি হয়েছো, তখন স্বীকার করতেই হয়···।

—কি ?

—সিদ্ধিলাভ করেছি। আমার ভালবাসাই জয়ী হয়েছে।

চার পাতা চিঠি লিখে কণিকা মামী গিরিডির উদাসীনের সব উদ্বেগ দূর ক'রে দিয়েছেন। রাজি হয়েছে নরেন। বিয়ের দিন ঠিক করবার কথাও বলেছে। নরেনের মা বলেছেন, পয়লা অঘ্রান খুব ভাল শুভদিন।

মামীর প্রাণটাও যেন হাঁপ ছেড়ে অনুভব করে, তাঁরও একটা জেদের তপস্যা সফল হয়েছে। নরেনের মত ছেলের সঙ্গে যূথিকার মত মেয়ের বিয়ে ঘটিয়ে দেওয়া চারটিখানি বুদ্ধি ও চেষ্টায় সম্ভব হয় না। গিরিডি থেকে যূথিকার মা তিন পাতা চিঠি লিখে মামীকেও অভিনন্দন জানিয়েছেন, তোমার চেষ্টা আর বুদ্ধির জোরেই মেয়েটার ভাগ্য প্রসন্ন হতে পেরেছে কণিকা। নরেনের মাকে জানিয়ে দিও, আমরা পয়লা অঘ্রানেই রাজি।

মামীর চিন্তায় শুধু একটা অস্বস্তি মাঝে মাঝে ছটফট ক'রে ওঠে। যূথিকা এত বেশি ঘুমোয় কেন? জেগে থাকে যখন, তখনও যেন অদ্ভুত একটা কুঁড়েমির জ্বরে গুটিসুটি হয়ে এঘর কিংবা ওঘরের বিছানার এক কোণে বসে হাই তোলে, আর ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকায়। যে-কথা কোনদিন যূথিকাকে বলতে হয়নি, সেই কথাই আজকাল বলতে হয়, একটু ভাল ক'রে সাজ করবার কথা। ভাল করে সাজবার নিয়মটাই যেন ভুলে গিয়েছে যূথিকা। কিন্তু খুব ভাল করেই জানে যূথিকা, সন্ধ্যা হবার আগেই নরেন এসে পড়ে। তবু, বিকেল হয়ে এলেও যূথিকার মনে পড়ে না যে, এইবার তাড়াতাড়ি সেজে নেওয়া উচিত। মামী মনে করিয়ে দেন, তবে বুঝতে পারে, এবং তারপরেই ব্যস্তভাবে সাত-তাড়াতাড়ি একটা এলোমেলো সাজ করে। আর, অরুণকে কোলে নিয়ে যত আজে-বাজে কথা বলতে থাকে। অরুণও টানা-ছেঁড়া ক'রে যূথিকার সাজ আর খোঁপাটাকে আরও এলোমেলো ক'রে দেয়।

নরেনের সঙ্গে বেড়িয়ে, বড় জোর এক মাইল পথ হেঁটে, আবার যখন ঘরে ফিরে আসে যূথিকা, তখন দেখে মনে হয়, যেন দু'দিন না খেয়ে একশো মাইল হেঁটে একেবারে ক্লান্ত ও আধমরা হয়ে গিয়েছে যূথিকার চেহারাটা। এ আবার কোন্ ধরণের মানসিক ব্যাধি? মামীর চোখ দুটো আবার সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে।

শুধু মামী কেন, যূথিকাও যে যূথিকাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে। ধুলোখেলার পালা সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে, হাতের কাছে মুক্তা এসে গিয়েছে, তবে আবার জীবনের অহঙ্কারটা এমন ক'রে মুসড়ে পড়ে কেন? জিত হলো, তবুও হেরে গিয়েছি বলে একটা সন্দেহের অস্বস্তি মনের ভিতরে কাঁটার মত খচখচ করে কেন?

কে হারিয়ে দিল? লতিকা? ভাবতে গিয়ে কপালের দু'পাশে একটা জ্বালার কামড় জ্বলতে থাকে যেন। মামী বুঝবেন কি ছাই?

মামী কল্পনাও করতে পারেন না, পাটনা থেকে লতিকার গিরিডি যাবার ট্রেনযাত্রা যে লতিকার জীবনের একটা জয়যাত্রা। হিমাদ্রি চা এনে দিয়েছে, সেই চা হেসে হেসে খেয়েছে লতিকা। লতিকার ঘুম পেয়েছে, আর ব্যস্ত হয়ে বাঙ্কের উপর থেকে বেডিং নামিয়ে লতিকার জন্য বিছানা পেতে দিয়েছে হিমাদ্রি। লতিকা চালাক; কি-ভয়ানক চালাক, সেটা মামীর ধারণাতেই নেই। নিরালা কামরার সীটের উপর পাতা বিছানায় টান হয়ে শুয়েছে লতিকা, আর হিমাদ্রিকে মাথার কাছে বসিয়ে রেখে সারা রাত গল্প করেছে।

আর হিমাদ্রি? হ্যাঁ লতিকাকে দোষ দিয়ে লাভ কি? হিমাদ্রিই যে যত নষ্টের মূল। কি-ভয়ানক চালাক বোকা! চট্ ক'রে কত তাড়াতাড়ি জীবনের ট্রেনযাত্রার এক নতুন বান্ধবী জোগাড় করে নিলঁ। পয়লা অঘ্রানের পর আর ক'টা দিনই বা গিরিডি ও পাটনার মুখ দেখবার সুযোগ পাওয়া যাবে? বড় জোর দশটা দিন। নরেনের ছুটি ফুরিয়ে যাবার আগেই নরেনের সঙ্গে যূথিকাকে বোম্বাই চলে যেতে হবে। তারপর? তারপর আর কি? লতিকা আর হিমাদ্রি অনন্তকাল ধরে পাটনা থেকে গিরিডি আর গিরিডি থেকে পাটনা যাওয়া-আসা ক'রে চমৎকার ট্রেনযাত্রার পুণ্যে ধন্য হয়ে থাকবে।

গিরিডি থেকে চিঠি আসে। কিন্তু সে চিঠিতে বিশ্বের যত খবর থাকুক না কেন, শুধু একটি খবরের কোন উল্লেখ থাকে না। হিমাদ্রি এখন কোথায়? লতিকা সত্যিই গিরিডি ফিরেছে তো? ফিরেছে নিশ্চয়। যাবে আর কোথায়? পাটনা ছেড়ে দিয়ে এখন গিরিডিতে গিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে লতিকা। এবং আশ্চর্য নয়, গণেশবাবুর বাড়িতে রোজ সন্ধ্যায় চা খেতে আসছে হিমাদ্রি।

পাটনা নয়, গিরিডিই যে যূথিকার জীবনের উদ্বেগ হয়ে উঠলো। কোনদিন কল্পনাতেও সন্দেহ করতে পারেনি, কোন মুহূর্তেও একটু

সাবধান হয়ে কল্পনা করতে পারেনি যূথিকা, লতিকার মত মেয়ে যূথিকাকে এভাবে একটা মিথ্যা জয়ের কাছে ফেলে রেখে দিয়ে নিজে একটা খাঁটি জয়ের কাছে চলে যেতে পারে। পয়লা অঘ্রান আসতে দেরি আছে। তবে এখন আর পাটনাতে থাকবারই বা কি দরকার? এখন গিরিডি চলে গেলেই তো হয়।

গিরিডির চিঠি আসতেও আর বেশি দেরি হয়নি। মা লিখেছেন, যূথিকার এখন গিরিডি চলে আসাই উচিত মনে করি কণিকা। যূথিকাকে আসবার জন্য বলাইবাবুকে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি; তুমি একেবারেই বরযাত্রী হয়েই এস। বর আনতে এখান থেকে যাবার লোক কেউ নেই। তোমার আর অরুণের বাবা, দুজনের ওপর বর আনবার সব দায়িত্ব রইল।

গিরিডির চিঠিটা যূথিকাকেও পড়তে দিলেন মামী। চিঠি পড়েই কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকে যূথিকা। তারপরেই বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।—বলাইবাবুকে পাঠিয়ে লাভ কি? বাতে পঙ্গু একটা মানুষ।

মামী—তবে কি একাই গিরিডি যেতে চাও?

যূথিকা—একা যাব কেন? হিমাদ্রি কি নেই?

অপলক চোখ তুলে যূথিকার মুখের দিকে তাকিয়ে কি-যেন ভাবেন মামী। মামীর দু'চোখের মধ্যে যেন একটা ভয়ের ছায়া ছমছম করে। আস্তে আস্তে এবং ভয়ে ভয়ে বলেন মামী—বারবার হিমাদ্রিকে বিরক্ত করা ভাল দেখায় না।

যূথিকা চেঁচিয়ে ওঠে।—হিমাদ্রি যে বিরক্ত হয় না, সেটা মা খুব ভালই জানে।

মামী—আমার মনে হয়, হিমাদ্রিকে না পাঠালেই ভাল হয়।

যূথিকা—বেশ। তাহলে বলাইবাবুকেও আসতে বারণ ক'রে দাও।

মামী—তার মানে ?

যূথিকা হেসে ফেলে—আমি একাই গিরিডি যাব।

ছলে ছলে হেঁটে ঘরের ভিতরে ঢোকে ছোট্ট অরুণ। অরুণের হাতে একটা চিঠি। অরুণ বলে—একটা লোক।

চিঠি খুলে দু'লাইন পড়তেই আশ্চর্য হয়ে যান মামী, এবং বাইরের বারান্দার দিকে উঁকি দিয়ে তাকান।

যূথিকা—কি ব্যাপার ?

মামী বলেন—হিমাদ্রি এসেছে।

ঝক ক'রে হেসে ওঠে যূথিকার চোখ। শাড়ির আঁচলটাকে টেনে গায়ে জড়িয়ে ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায় যূথিকা।—তার মানে ?

মামী বলেন—কুসুমদি লিখেছেন, বলাইবাবুর পক্ষে যাওয়া অসম্ভব। হিমুকেই পাঠালাম।

মামীর দুশ্চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে মামা বললেন—না, আমার মনে হয়, সে-রকম কোন ভয়ের কারণ নেই।

মামী—তবু, আমি কিন্তু নিশ্চিত হতে পারছি না।

মামা—ভদ্রলোকের মেয়ে মাথা খারাপ ক'রে বাজে লোকের সঙ্গে উধাও হয়ে গিয়েছে, এরকম কেস অবশ্য মাঝে মাঝে দেখা যায়। কিন্তু বেচারা যূথিকাকে এরকম মাথাখারাপ মেয়ে মনে করতে পারছি না।

মামী—কিন্তু হিমাদ্রি নামে এই ছেলেটার মনে কি আছে, সেটা কি ক'রে বুঝবে বল ?

মামা কিছুক্ষণ ভাবেন। তারপর বলেন—আচ্ছা, একটা ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।

মামী—কি ব্যবস্থা ?

মামা—আমি এখনি গিয়ে ভোলাকে···রেলওএ পুলিশের ডি-এস-পি ভোলাকে চেন তো ?

মামী—খুব চিনি।

মামা—ভোলাকে বলে দিচ্ছি, যেন ট্রেনের গার্ডকে প্রাইভেটলি বলে রাখে ভোলা, ওদের দু'জনের উপর একটু ওয়াচ রাখবার জন্য। আমি চললাম···ওদের তাড়াতাড়ি রওনা করিয়ে দাও।

রওনা হতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট দেরি করিয়ে দিলেন মামী, অর্থাৎ টেলিফোনে নরেনকে একটা খবর দিতে যতটুকু সময় লাগলো, তার বেশি নয়। এবং স্টেশনে পৌঁছবার পর খুশি হয়ে দেখলেন মামী, যাদের আসবার কথা ছিল, তারা সবাই এসেছে। মামা এসে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছেন, তার পাশে নরেন। এবং, কি আশ্চর্য, শীতাংশু ডাক্তারও এসেছে।

সব চেয়ে বেশি আশ্চর্য, শীতাংশু ডাক্তার হেসে হেসে নরেনের সঙ্গে গল্প করছে। এমন কি মামাকেও হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে ফেলে শীতাংশু—পয়লা অঘ্রানই বোধ হয় বিয়ের দিন ঠিক করা হয়েছে ?

মামা গম্ভীর হয়ে বলেন—বোধ হয়।

শীতাংশু বলে—বড় ভাল হলো।

শীতাংশুর কথা শুনে মামীর মুখটা অপ্রসন্ন হয়ে যায়। কি রকম ঢং ক'রে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে শীতাংশু, যেন ছোট ভাইটির বিয়ের খবর শুনে আহ্লাদে মজে গিয়েছে। কিন্তু মামীই জানেন, এই শীতাংশুই এই কটা বছর এই বিয়ের সম্ভাবনাকে ভাংচি দিয়ে মিথ্যে ক'রে দেবার জন্য কী চেষ্টাই না ক'রে এসেছে। তবে আবার কিসের আশায়, কোন্ মতলবের উৎসাহে এখানে এসেছে শীতাংশু ? মামী ডাকেন—এদিকে এসে একটা কথা শুনে যাও নরেন।

শীতাংশুর কপট শুভেচ্ছার স্পর্শ থেকে নরেনকে সরিয়ে নিয়ে

গিয়ে পাটনার প্রচণ্ড গরমের জন্য দুঃখ ক'রে অনেক কথা বললেন মামী।—কার্তিক শেষ হতে চললো, তবু দেখছো, গরমের গুমোট ছাড়ছে না।

ট্রেনে ওঠবার জন্য যূথিকার ব্যস্ততা দেখে মনে মনে রাগ করেন মামী। নরেনের কাছ থেকে অনেকক্ষণ হলো ইচ্ছে করেই সরে গিয়েছেন মামী। এই তো, এইবার একটা সুযোগ পেলি বোকা মেয়ে। নরেনের কাছে এসে একবার দাঁড়া। দু'টো কথা বল্। কিন্তু কোথায় যূথিকা? কাণ্ডজ্ঞানহীন যূথিকা তখন ট্রেনের কামরার ভিতরে ঢুকে হিমাদ্রির সঙ্গে কী অদ্ভুত মুখরতা আর হাসাহাসি শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু মনের অভিযোগ মনেই চেপে রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন মামী।

—আমি কিন্তু জানালার ধারে বসবো হিমাদ্রি। হাত-ব্যাগটাকে সীটের নীচে রেখে দাও হিমাদ্রি।

বড় বেশি ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, আর কি বিশ্রী চেঁচিয়ে কথা বলছে মেয়েটা! যূথিকার কাছে এগিয়ে এসে মামী ফিসফিস ক'রে বলেন—আস্তে কথা বল যূথিকা।

ট্রেন ছাড়লো, এবং যূথিকা যেন এতক্ষণের ব্যস্ততার ভুলের মধ্যে বিমনা হয়ে থাকা মনটাকে চিনতে পেরে চমকে ওঠে। ভুল হয়েছে, ভয়ানক বিশ্রী ভুল। নরেনের সঙ্গে সামান্য একটু চোখে চোখে কথা বলে নিতেও ভুলে গিয়েছে। এই ভুলটুকু শুধরে দেবার জন্য জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে নরেনের দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে যূথিকা।

হাসিভরা মুখটাকে জানালার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসে যূথিকা, কারণ প্ল্যাটফর্মের কোন মুখ আর চেনা যায় না। ঝাপসা হয়ে গিয়েছে পাটনা স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম।

এইবার চোখের কাছে যাকে খুব স্পষ্ট ক'রে দেখতে পায়

যূথিকা, তারই শান্ত মুখের চেহারাটাকে সহ্য করতে গিয়ে ছটফট ক'রে ওঠে।

যূথিকা বলে—কেমন আছ হিমাদ্রি ?

হিমু হাসে—ভাল আছি।

যূথিকা—লতিকা ভাল আছে ?

হিমু—জানি না। ভাল থাকলেই ভাল।

যূথিকা—খোঁজ রাখ না ?

হিমু—খোঁজ রাখা আমার অভ্যাস নয়।

যূথিকা—কিন্তু লতিকার তো সে অভ্যাসটি আছে।

হিমু—জানি না।

যূথিকা—কেন ? লতিকা খোঁজ করেনি ?

হিমু—কার খোঁজ ?

যূথিকা—তোমার।

হিমু—না।

যূথিকা—আশ্চর্যের ব্যাপার।

হিমু—কিসের আশ্চর্য ?

যূথিকা—এত গরজ ক'রে পাটনা থেকে গিরিডি নিয়ে গেলে যাকে, তার সঙ্গে সামান্য একটু বন্ধুত্বও হলো না।

হিমু—না।

যূথিকা—তোমার দুর্ভাগ্য।

হিমু—একটুও না।

যূথিকা—কেন ? লতিকা কি দেখতে সুন্দর নয় ?

হিমু—সুন্দর বৈকি।

যূথিকা—আমার চেয়েও সুন্দর নিশ্চয়।

হিমু—লোকে তো তাই বলে।

যূথিকা—কে বলে ?

হিমু—তোমার মা বলছিলেন।

যূথিকা—কার কাছে?

হিমু—তোমার বাবার কাছে।

যূথিকা—তোমার সামনেই?

হিমু—হ্যাঁ।

যূথিকা—আর তুমিও বেশ দু'কান ভরে কথাটা শুনে নিলে?

হিমু—হ্যাঁ, কানে শুনতে পাই যখন, তখন না শুনে পারবো কেন?

যূথিকা—কিন্তু কথাটা এত মনে ক'রে রাখতে বলেছে কে? মনে হচ্ছে, কানের ভিতর দিয়ে একেবারে মরমে পশেছে।

হিমু—না।

যূথিকা—জোর করে না বললে কি হবে?

হিমু—কত কথাই তো শুনতে পাই, কিন্তু মরমে পশে আর কোথায়?

যূথিকা—মরম নেই তাহলে?

হিমু—হবে।

যূথিকা—আমার তো তাই মনে হয়।

হিমু—বেশ ভাল মন তোমার।

হিমু দত্তের শান্ত চোখ দুটোও যেন উদাসীনের মেয়ে যূথিকা ঘোষের এই অনর্থক বাচালতায় বিরক্ত হয়ে, এবং একটু তপ্ত হয়ে যূথিকার মুখের দিকে তাকায়। সেই মুহূর্তে ভয় পেয়ে কেঁপে ওঠে হিমু দত্তের চোখ। বিনা দোষের আসামী ফাঁসির হুকুম শুনেও বোধহয় এমন ভয় পাবে না। দেখতে পেয়েছে হিমু, চারু ঘোষের মেয়ের চোখ দুটো জলে ভরে গিয়েছে।

এমন ভয়ানক বিপন্নতা, এত কঠোর শাস্তি, জীবনে কোন দিন সহ্য করবার দুর্ভাগ্য হয়নি হিমু দত্তের; এর চেয়ে যূথিকা ঘোষের

চোখের সেই সব ভয়ানক অবহেলার আর কৌতুকের হাসিতে যে অনেক বেশি করুণা ছিল।

হিমু বলে—আমাকে মাপ কর যূথিকা; কিন্তু বুঝতে পারছি না, আমার কি অপরাধ হলো।

চোখ দুটোকে এক মুহূর্তের মধ্যেই সামলে নিয়ে শুকনো ক'রে ফেলেছে যূথিকা।

যূথিকা বলে—যাক গে, তুমি কিছু মনে করো না হিমাদ্রি। তোমাকে সত্যিই অপরাধী বলছি না।

হাঁপ ছাড়ে, বুকের ভিতরের একটা ভয়াতুর বেদনার গুমোট যেন নিঃশ্বাসের জোরে ভেঙ্গে দিয়ে হাঁপ ছাড়ে হিমু। নস্থির ডিবে ঠুকে ঠুকে হাসতে চেষ্টা করে।—গিরিডিতে এখন বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। সকাল বেলা রোদ ওঠবার পরেও উশ্রীর ওপর কুয়াশা একেবারে জমাট হয়ে থাকে।

যূথিকাও হাসে—সত্যি কথা বলবে?

হিমু—তোমার কি সন্দেহ আছে; আমি সত্যি কথা বলি না?

যূথিকা—না, তুমি সে বিষয়ে একেবারে খাঁটি গুড বয়। তাই জিজ্ঞাসা করছি।

হিমু—বল।

যূথিকা—লতিকা তোমাকে আমার মত বিরক্ত করেনি?

হিমু—একটুও না।

যূথিকা—চা এনে দাও, বিছানা পেতে দাও, হেন তেন কোন হুকুমই করেনি?

হিমু—না। বরং লতিকাই ওসব কাণ্ড করেছে। আমি আপত্তি করেছি, তবুও শোনেনি।

যূথিকার চোখের দৃষ্টি আবার কঠোর হয়ে ওঠে।—তার মানে, লতিকা তোমার খুব সেবাযত্ন করেছে?

হিমু—একটু বাড়াবাড়ি করেছে বলতে হবে। নিজেই হাঁক দিয়ে চা-ওয়ালাকে ডেকে এনে আমাকে চা খাইয়েছে। বিছানাটাকেও আমার জন্য ছেড়ে দিয়ে, নিজে সারারাত জেগে উলের টুপি বুনেছে। একটু বেশি ভদ্রতা করেছে লতিকা।

যূথিকা ভ্রুকুটি ক'রে মুখ ফেরায়—কিন্তু তাই বলে লতিকা তোমাকে বিয়ে করতে পারে না।

হিমু—আমিই লতিকাকে বিয়ে করতে পারি না।

যূথিকা—কেন ?

হিমু—আমার মত মানুষকে লতিকার বিয়ে করা উচিত নয় বলে।

যূথিকা—নিজেকে কি তুমি এতই ছোট মনে কর ?

হিমু—একটুও ছোট মনে করি না।

যূথিকা—তবে ?

হিমু—লোকে তো ছোট মনে করে।

যূথিকা—আমিও মনে করি কি ?

হিমু—তোমার মন জানে !

আবার হিমু দত্তের দু'চোখের দৃষ্টি উত্ত্যক্ত হয়ে, আর যূথিকার এই অকারণ বাচালতার উপর বেশ কুপিত হয়ে যূথিকার মুখের উপর পড়তেই চমকে ওঠে আর ভয় পায় হিমু। যূথিকা ঘোষের চোখের পাতা ভিজে ভারি হয়ে গিয়েছে।

হিমু দত্ত ভয়ে ভয়ে অনুরোধ করে।—গল্প করবার এত জিনিস থাকতে তুমি আজ কেন মিছিমিছি এসব কথা তুলে ট্রেনযাত্রার আনন্দটা মাটি করছো যূথিকা ?

হিমুর কথার কোন উত্তর না দিয়ে হঠাৎ ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায় যূথিকা। নিজেই হাত বাড়িয়ে সীটের তলা থেকে একটা ছোট বাস্কেট বের করে। বাস্কেট খুলে খাবারের প্যাকেট ও একটা ডিস

বের করে। আর, ডিসের উপর খাবার সাজিয়ে দিয়েই বলে—খাও হিমাদ্রি।

হিমাদ্রি অপ্রস্তুতের মত বলে—একি? তোমার খাবার কোথায়?

যূথিকা হাসে—এই তো। একই ডিসে দু'জনে খেতে পারা যায় না কি?

সত্যিই হাত বাড়িয়ে ডিসের উপর সন্দেশ ভাঙ্গে যূথিকা। এবং খেতেও কোন দ্বিধা করে না।

খাবার খেতে গিয়ে হেসে ফেলে হিমু—একটা কাণ্ডই করলে তুমি।

যূথিকা মুখ টিপে হাসে—কেন করলাম, বুঝতে পারলে কিছু?

হিমু—না।

যূথিকা—লতিকাকে হারিয়ে দিলাম। কেমন? ঠিক কিনা? লতিকা নিশ্চয় এতটা করতে পারেনি?

—না। কথাটাকে কেমন উদাসভাবে, যেন একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে চুপ করে খাবার খেতে খেতে হিমু আবার আনমনার মত হঠাৎ বলে ওঠে।—এই তো আমাদের শেষ ট্রেনযাত্রা।

—অ্যাঁ, কি বললে? হিমু দত্তের মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে যেন একেবারে ক্লান্ত হয়ে ঢুলে পড়ে যূথিকা ঘোষের চোখের চাহনি। শেষ ট্রেনযাত্রা? তার মানে কি? হিমাদ্রির সঙ্গিনী হয়ে এক ট্রেনে পাটনা থেকে গিরিডি আসা-যাওয়ার পালা চিরকাল চলতে থাকবে, এইরকম একটা জীবন কি সত্যিই কল্পনায় কামনা ক'রে রেখেছিল যূথিকা? নইলে এত আশ্চর্য হয়ে যায় কেন যূথিকা? এবং হিমুর এত সহজ ও সরল কথাটা বুঝতে এত দেরি করে ক ন

বুঝতে দেরি হয়নি যূথিকার। চোখের সামনে একটা শূন্যতার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে, হ্যাঁ, হিমাদ্রির সঙ্গে এই শেষ ট্রেন-যাত্রা। ধূলোখেলার বন্ধুত্বের এই শেষ। বেশ হলো, খুব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল।

যূথিকা বলে—খবরটা তাহলে তুমিও শুনেছ হিমাদ্রি?

হিমু—কিসের খবর?

যূথিকা—আমার বিয়ের।

হিমু—হ্যাঁ, সেই জন্যেই তো বললাম।

যূথিকা—কি?

হিমু—এই আমাদের শেষ ট্রেনযাত্রা। তাই মিছে আর তর্ক-টর্ক ক'রে কেন শেষ দিনের আনন্দটা নষ্ট করা?

যূথিকা—আনন্দ?

হিমু—আনন্দ বৈকি। তুমি যা চেয়েছিলে, তাই পেলে, এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কি হতে পারে?

যূথিকা—সত্যি ক'রে বল হিমাদ্রি। শুনে তোমার খুব আনন্দ হচ্ছে?

হিমু—হ্যাঁ।

যূথিকা—আনন্দের মধ্যে কি এতটুকু···

হিমু—কি?

যূথিকা—কষ্ট হচ্ছে না?

চমকে মুখ ফিরিয়ে নেয় হিমু দত্ত। নইলে হিমুর জীবনের একটা দুঃসহ বেদনার নিঃশ্বাস বোধহয় এখনি চারু ঘোষের মেয়ের মুখের উপর ছড়িয়ে পড়বে আর ধরা পড়ে যাবে হিমু। মাথা হেঁট করে, চোখ-মুখ একেবারে বিবর্ণ ক'রে আর বোবা হয়ে বসে থাকে হিমু।

হিমুর মুখের দিকে তাকিয়ে জোরে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে যূথিকা হাসে—তোমার ওপর আমার আর রাগ নেই হিমাদ্রি।

হিমু—কেন বল তো ?

যূথিকা—লতিকার কাছে হার মানতে হলো না। আমারই জিত হয়েছে।

ট্রেনটা থেমেছে। খুব আলোয় ভরা জমজমাট আর গমগমাট একটা স্টেশন। যেমন লোকের ভিড়, তেমনিই কোলাহল। ট্রেনের কামরার একই জানালার ভিতর দিয়ে পাশাপাশি দু'টি মুখ উঁকি দিয়ে যেন চঞ্চলতা আর মুখরতার একটা আলোকিত উৎসবের মত একটা দৃশ্য দেখতে থাকে। যেন চিরকালের বন্ধু ও বান্ধবীর দু'টি হর্ষোৎফুল্ল মুখ। এবং দু'জনেই জানে না, কখন কোন্ মায়ার আবেশে দু'জনের দু'টি হাতের ছোঁয়াছুঁয়ি মুঠোবাঁধা হয়ে এক হয়ে গিয়েছে।

ট্রেন ছেড়ে দেয়। যূথিকা বলে—আমি সত্যিই কিছু বুঝে উঠতে পারছি না হিমাদ্রি।

হিমু—কি ?

যূথিকা—সত্যিই কি সোনা ফেলে দিয়ে আঁচলে গেরো দিলাম।

হিমু—তার মানে ?

যূথিকা—মানে জিজ্ঞাসা করো না হিমাদ্রি। বুঝতে না পার যদি, তবে চুপ করে থাক।

চুপ করে হিমাদ্রি। যূথিকা হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—বড় ক্লান্ত লাগছে শরীরটা, বুকের ভিতরেও যে হাঁপ ধরছে হিমাদ্রি; আমি এভাবেই জানালায় মাথা রেখে একটু ঘুমিয়ে নিই, কেমন ?

হিমু—নিশ্চয়। তুমি চুপ করে ঘুমোও।

যূথিকা—তুমি সরে যেওনা কিন্তু।

হিমু—না, কখ্খনো না।

কিন্তু ঘুমোতে পারে না যূথিকা। ঘুমটাই যেন থেকে থেকে ফুঁপিয়ে ওঠে, আর হিমু দত্তের হাতটাকে আরও শক্ত ক'রে খিমচে ধরে রাখে যূথিকা।

সামনের সীটের এক ভদ্রলোক বলেন—ওঁর কোন অসুখ আছে বলে মনে হচ্ছে।

হিমু বলে—না। হঠাৎ কাহিল হয়ে পড়েছেন।

ভদ্রলোক আক্ষেপ করেন—তাইতো। বড় দুঃখের বিষয় হলো। আপনিও বড় নার্ভাস হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে।

ভদ্রলোকের কথার জবাব না দিলেও হিমু বোধহয় নিজের মুখটাকে কল্পনায় দেখতে পায়। যেন একটা ক্ষেপা হাওয়ার মাতামাতির মাঝখানে, রাতের নদীর বুকের উপর ভাঙা নৌকাতে দাঁড়িয়ে পূর্ণিমার চাঁদের শোভা দেখছে হিমু দত্ত। এই নৌকা ডুবে যাবে, অথই জলে তলিয়ে যেতে হবে, সবই জানে হিমু; কিন্তু, তবু পূর্ণিমার চাঁদ দেখবার লোভ যেন ছাড়তে পারছে না। হাসিটা কেঁদে ওঠেনি, হিমু দত্তের জীবনের কান্নাটাই যেন ওর মুখের ওপর হেসে রয়েছে।

হিমু দত্তের বুকের কত কাছে চারু ঘোষের মেয়ের মাথাটা। হাতের উপর কপাল নামিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে যূথিকা। যূথিকার খোঁপার সুগন্ধও হিমু দত্তের নাকের কত কাছে মাতামাতি করছে।

হঠাৎ বাইরে থেকে গুঁড়ো বৃষ্টির একটা ঝাপটা এসে যূথিকার মাথাটাকে ভিজিয়ে দেয়। রুমাল দিয়ে যূথিকার মাথা মুছে দিতে হিমু দত্তের হাতটা আজ আর কোন লজ্জায় আর কোন ভয়ে কাঁপে না।

মুখ তোলে যূথিকা।—আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি।

হিমাদ্রি—বল।

যূথিকা—দরকার হলে তুমি কি আমাকে বোম্বাই থেকে গিরিডিতে আনতে পারবে না?

হিমাদ্রি—দরকার কেন হবে?

যূথিকা—আমি বলছি, দরকার হবে।

—না। দরকার হলেও না।

যূথিকা—ঠিকই ভেবেছিলাম আমি, তুমি একথা বলবে। তুমি ভয়ানক চালাক।

হিমু—তোমার বোকামির জন্যেই চালাক হতে হচ্ছে।

যূথিকা আবার জানালার কাঠের উপর হাত রেখে আর মাথা পেতে ঘুমোতে চেষ্টা করে। তন্দ্রাটা মাঝে মাঝে নিবিড় হয়ে ওঠে ঠিকই, কিন্তু অদ্ভুত কতগুলি ঠাট্টার ভাষা যেন মাথার ভিতরে এক-ঘেয়ে সুরে বাজতে থাকে। পাটনাতে মামীর সঙ্গে একবার হীরালাল বাবুর বাড়িতে কীর্তন শুনতে গিয়ে যে গানের ন্যাকামি সহ্য করতে না পেরে দু-মিনিট পরেই বাড়ি ফিরে গিয়েছিল যূথিকা, সেই গানেরই ভাষা যূথিকার এই ক্লান্ত মাথার ভিতরে প্রচণ্ড উৎপাতের শব্দের মত বেজে চলেছে। পীরিতিক রীতি শুন বরনারী!

আজ যূথিকাকে বাগে পেয়ে সেদিনের গানটা যেন যূথিকার অহঙ্কারের উপর প্রতিশোধ তুলছে। পীরিতের রীতিতে ভুল হলে কি দশা হয়, সেটাও ইনিয়ে বিনিয়ে শুনিয়ে দিয়েছিল গানটা তুহারি ভরম ফান্দে, তুহারি করম কান্দে। বাঃ, চমৎকার!

চান্দ কিরণ ছোড়ি, দাবানল পরশিলি। অব কাহে ফুকারে হুতাশা। কিসের ছাই হুতাশা? এত ভয় করবার কি আছে?

ধড়ফড় ক'রে জেগে আর মুখ তুলে হিমুর কানের কাছে যেন স্বপ্নের ঘোরে একটা প্রলাপ ফিসফিস করে যূথিকা—আমি যদি বোম্বাই না যাই হিমাদ্রি?

হিমু—তার মানে?

যূথিকা—তার মানে নরেনের সঙ্গে যদি আমার বিয়ে না হয়?

—ছিঃ, মাথা খারাপের আর কিছু বাকি নেই তোমার? রুক্ষ-স্বরে, প্রায় ধমকের মত একটা ভঙ্গী ক'রে উত্তর দেয় হিমু।

হেসে ফেলে যূথিকা—তার মানে আমাকে নিয়ে পালিয়ে যাবার সাহস তোমার নেই।

হিমু—না নেই।

যূথিকা—কেন?

যূথিকার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তীব্র তীক্ষ্ণ ও যন্ত্রণাক্ত একটা দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থেকে হিমু বলে—তোমাকে ভালবাসি বলে।

চমকে ওঠে যূথিকার চোখ আর মুখ। হঠাৎ সূর্যোদয়ের আভা ঘুমন্ত চোখ আর মুখের উপর ছড়িয়ে পড়লে যে-রকম চমক লাগে, সেইরকম চমক। যেন যূথিকার জীবনের একটা আশার স্বপ্নালু আবেশ হঠাৎ আলোকের ছোঁয়া লেগে জ্বলে উঠেছে। হিমুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে যূথিকা; দুই চোখে নিবিড় তৃপ্তির স্নিগ্ধতা জ্বল জ্বল করে।

থেমে গেল ট্রেনটা। রাত প্রায় ভোর-ভোর হয়েছে। প্রায় নির্জন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের উপর দিয়ে মচ মচ ক'রে জুতোর শব্দ বাজাতে বাজাতে জানালার কাছে এসে থমকে দাঁড়ালেন ট্রেনের গার্ড।—আপনাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?

হিমু একটু আশ্চর্য হয়ে বলে—না।

চলে গেলেন গার্ড। এবং ট্রেনটাও আবার চলতে শুরু করে। যূথিকা চোখ মুছে নিয়ে আস্তে আস্তে বলে—তুমি এত স্পষ্ট ক'রে এ কি কথা বলে ফেললে হিমাদ্রি?

হিমু—মিথ্যে কথা বলিনি।

যূথিকা—কিন্তু শুধু আমার কাছেই বলতে পারলে। আর কারও কাছে বলবার সাহস আছে কি?

হিমু—সাহস খুব আছে; কিন্তু বলবার দরকার হবে না।

যূথিকা—যদি দরকার হয়?

হিমু—তার মানে?

যূথিকা—যদি নরেন তোমায় হঠাৎ জিজ্ঞাসা ক'রে বসে, তবে? সত্যি কথাটা বলতে পারবে তো?

হিমু বলে—না।

যূথিকা—এই তো তোমার সাহস! আর এই রকমই সত্যবাদী তুমি!

হিমু—যা ইচ্ছে হয় বল, আমি তোমার ক্ষতি করতে পারবো না। দরকার হলে হাজারটা মিথ্যে কথা বলে দেব।

যূথিকা—তাই বল। পথে এসো এবার।

হিমু—কিন্তু তুমি কি পারবে?

যূথিকা—কি?

হিমু—নরেন বাবুর কাছে সত্যি কথা বলে দিতে?

যূথিকা—কোন্ সত্যি কথা?

উত্তর দেয় না হিমু। যূথিকার কথার জালে জড়িয়ে পড়ে হিমুর মনের সব চেয়ে লোভনীয় একটা লোভ এইবার ধরা পড়ে গিয়েছে। কি জানতে চায় হিমু?

যূথিকা হাসে—বল হিমাদ্রি, কোন্ সত্যি কথা জানতে চাইছো?

যূথিকার এই হাসিটা কি চারু ঘোষের মেয়ের মনের সেই শুকনো কৌতুকের হাসি? তাই যদি হয়, তবে হিমু দত্তের জীবনের চরম কৌতূহল এই মুহূর্তে হিমু দত্তের বুকের ভিতরে শেষ আর্তনাদ তুলে ফুরিয়ে যাবে। ভালই হবে। আর দুঃখ করবার, এবং সারা জীবন মনের মধ্যে গোপন রত্নের মত লুকিয়ে রাখবার কিছু থাকবে না।

যূথিকা বলে—হ্যাঁ হিমাদ্রি, আমি অনায়াসে নরেনকেও বলে দিতে পারি যে, আমি হিমাদ্রিকে ভালবাসি।

ভালবাসে যূথিকা! শুধু এইটুকু জানবার সাধ যে হিমুর জীবনের চরম সাধ হয়ে আর স্বপ্ন হয়ে হিমুর বুকের ভিতর জমা হয়েছিল; সে সত্য ধরা পড়িয়ে দিলো হিমুর চোখ দুটো। ভিজে গিয়ে চিকচিক করে হিমু দত্তের সেই শান্ত ও নির্বিকার চোখ, যে চোখ কোন

মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয় না বলে বিশ্বাস করেন কৃষ্ণার মা, অতসীর কাকিমা, কল্যাণীর মামা, নিভার বাবা, সরযূর দাদা, আর প্রমীলার মা।

যূথিকা—এ কি করলে হিমাদ্রি? এর পরেও চাও, নরেনের সঙ্গে আমার বিয়ে হোক?

হিমু—নিশ্চয়।

যূথিকা—নিশ্চয় না।

হিমু—তাহলে নিশ্চয় কি? আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে কোনদিন?

যূথিকা—হলে মন্দ কি?

হিমু—অসম্ভব নয় কি?

যূথিকা—একটুও অসম্ভব নয়। শুধু তুমি রাজি হলেই হয়।

উত্তর দেয় না হিমু।

যূথিকা—বল, শিগ্‌গির বল, আমাকে যদি বিশ্বাস করে থাক, তবে এখুনি বলে দাও লক্ষ্মীটি!

—কি বিশ্বাস করবো? কি বলবো? প্রশ্ন করতে গিয়ে যেন দম বন্ধ ক'রে ছটফট করে হিমু।

যূথিকা—বিশ্বাস কর; আমি তোমাকে মিথ্যে কথা বলছি না; আমি তোমাকে ভালবাসি।

হিমু—বিশ্বাস করি।

যূথিকা—বিশ্বাস কর, তোমার সঙ্গে বিয়ে না হলে সুখী হতে পারবো না।

হিমু—বিশ্বাস করি।

যূথিকা—তবে আমাকে বিয়ে করতে তোমার বাধা কোথায়? রাজি হয়ে যাও হিমাদ্রি।

হিমু দত্তের মুখে যেন একটা করুণ ও খিন্ন হাসির আভা ফুটে

ওঠে। যেন বুকভরা একটা হাসির সুন্দর জ্বালা বুকের ভিতরেই দমিয়ে দিতে চেষ্টা করছে হিমু। যূথিকার মুখের দিকে অনেকক্ষণ অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে হিমু। কে জানে কি ফুটে উঠেছে হিমুর চোখে। আশা আনন্দ মায়া আর বিস্ময়? না, ভয় সন্দেহ কৌতুক আর ফাঁকি?

হিমু বলে—বেশ আমি রাজি আছি যূথিকা।

যূথিকা—তাহলে গিরিডি পৌঁছেই মামীকে একটা টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিই, এ বিয়ে হবে না।

হিমু—জানিয়ে দিও।

যূথিকা—কিংবা নরেনকেই একটা চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিতে পারি, কেন এ বিয়ে হতে পারে না।

হিমু—জানিয়ে দিতে পার।

যূথিকা—হিমাদ্রি?

হিমু—বল।

যূথিকা—বড় ঘুম পাচ্ছে হিমাদ্রি।

হিমু—ঘুমোও।

ট্রেনের কামরা নয়। উদাসীনের দোতলার একটি ঘর। উদাসীনের চারদিকে উঁচু পাঁচিল; সেই পাঁচিলের উপর আবার সারি সারি লোহার সূচীমুখ স্পাইক। একটি পাখিও সে পাঁচিলের উপর উড়ে এসে বসবার মত ঠাঁই পায় না। বসতে এলেই ডানাতে স্পাইকের খোঁচা খেয়ে ছটফট করে সেই মুহূর্তে উড়ে পালিয়ে যায়।

উদাসীনের দোতলার ঘরের ভিতরে সোফা চেয়ার আর পালঙ্কের উপর গড়াগড়ি দিয়েও যূথিকা ঘোষের মন থেকে ট্রেনযাত্রার ক্লান্তির ঘোর সহজে কেটে যায়নি। কিন্তু কেটে যেতে খুব বেশি সময়ও লাগেনি। সারা সকাল দুপুর আর বিকেল বেলাটা;

বাস্, তারপরেই যেন হঠাৎ চোখ মেলে জেগে উঠলো যূথিকা। উত্রীর বালুতে বিকালের আলো লুটিয়ে রয়েছে এবং মনেও পড়ে যূথিকার, পৃথিবীর একজনের কাছে একটা প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করে এসেছে যূথিকা, পাটনার মামীকে আজই টেলিগ্রাম ক'রে জানিয়ে দিতে হবে, এ বিয়ে হবে না।

টেলিগ্রামের ফরম নিয়ে কথাগুলি লিখতে গিয়ে বার বার হাত কাঁপে, বার বার রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মোছে যূথিকা। তারপরেই নীচের তলায় নেমে গিয়ে কুসুম ঘোষের কাছে এসে বলে—মামীকে এখুনি একটা টেলিগ্রাম করতে চাই, মা।

কুসুম ঘোষ—কেন ?

উত্তর দিতে গিয়ে বিড়বিড় করে যূথিকা। তারপরেই যেন একটা ভয়ের চমক লেগে কেঁপে ওঠে। এবং তার পরেই কে জানে কার উপর রাগ ক'রে আর প্রায় দৌড় দিয়ে আবার উপর তলায় চলে যায়।

সত্যিই একটা রাগ, সে রাগে গজগজ করে বুকটা, আর ঘেমে ওঠে কপালটা। টেলিগ্রাম করা হলো না। কিন্তু মনে পড়ে যূথিকার, নরেনের কাছে অনায়াসে একটা চিঠি লিখে সত্যি কথা জানিয়ে দিতে পারা যায়। পৃথিবীর একজনের কাছে এইরকম একটা প্রতিজ্ঞার কথা বলে রেখেছে যূথিকা।

চিঠি লিখতে দেরি করে না যূথিকা। অনায়াসে অনেক কথা লেখে এবং তার পরেই হঠাৎ ভয়ের চমক লেগে ছটফট ক'রে ওঠে; এবং সেই মুহূর্তে অনায়াসে চিঠিটাকে কুটি কুটি ক'রে ছিঁড়ে ফেলে।

ট্রেনের কামরার ভিতরে যেন স্বপ্নের ঘোরে মিথ্যে কথা বলে একটা অদ্ভুত অসম্ভব ও ভয়ানক অঙ্গীকার ক'রে হিমাদ্রির মনের ভিতরে একটা আশার স্বপ্ন ছড়িয়ে দিয়েছে যূথিকা; মনে পড়ে

সবই। এবং মনে পড়তেই বুকটা কেঁপে ওঠে, লজ্জাও পায় যূথিকা একটা অসার দুঃসাহসের লজ্জা। হিমাদ্রির সঙ্গে যূথিকা ঘোষের কোনদিন বিয়ে হতে পারে; একথা হিমাদ্রি কি সত্যিই বিশ্বাস করেছে?

বিশ্বাস করতে তো চায়নি মানুষটা। কিন্তু ঝোঁকের মাথায় কি-ভয়ানক ভুল ক'রে ফেললো যূথিকারই একটা অবুঝ বেদনা। বেচারাকে জোর ক'রে বিশ্বাস করানো হলো। রাজি হয়ে গেল হিমাদ্রি।

কে জানে এই শহরের কোন্ গলির কোন্ ঘরের নিভৃতে কেমন অন্ধকারের মধ্যে বসে এখন চারু ঘোষের মেয়ের অঙ্গীকারের কথাগুলিকে জীবনের এক নতুন সঙ্গীতের মত মনে মনে সাধছে, হিমাদ্রি? ছি ছি, কী ভয়ানক বোকা হিমাদ্রি বেচারার মন! সন্দেহ করেও শেষ পর্যন্ত নিজেই অদ্ভুত এক আশার হাসি হেসে সেই সন্দেহের জোর ভেঙ্গে দিল। উদাসীনের মত বাড়ির মেয়ের ট্রেনযাত্রার সাথী হতে পারে হিমাদ্রি; মনের কথা বলাবলি করবার বন্ধু হতে পারে হিমাদ্রি; আর একই ডিসে সাজানো খাবার খাওয়ার সঙ্গী হতে পারে হিমাদ্রি; কিন্তু উদাসীনের মেয়ে যূথিকা ঘোষের স্বামী হতে পারে না হিমাদ্রি। তাই যদি সম্ভব হতো, তবে যূথিকা ঘোষ সত্যি যূথিকা ঘোষ হবে কেন, আর হিমাদ্রিই বা হিমাদ্রি হবে কেন?

ছি ছি, শুধু কয়েকটা কথার ভুলে কি অদ্ভুত এক কাণ্ড বাধিয়ে, একটা মানুষের সাদা মনের উপর মিছিমিছি রং ছিটিয়ে দিয়ে এখন ভয় ক'রে আর লজ্জা পেয়ে লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে! হিমাদ্রি এখন কোন দুঃস্বপ্নেও এমন সন্দেহ করতে পারছে না যে, পয়লা অঘ্রান নরেনকে নিয়ে হাসতে হাসতে আর উৎসবের বাঁশি বাজাতে বাজাতে এই উদাসীনের মেয়ের জীবনের কাছে

হু হু করে ছুটে আসছে। টেলিগ্রাম করে কিংবা চিঠি লিখে পয়লা অঘ্রানের ইচ্ছাটাকে কোনই বাধা দেবার ক্ষমতা হয়নি যুথিকার। যুথিকা ঘোষ যে সত্যিই পয়লা অঘ্রানের উৎসবে সাজবার জন্য এরই মধ্যে তৈরি হয়ে গিয়েছে। শর্মা ব্রাদার্সের স্টোর থেকে নানা ডিজাইনের ও নানা রং-এর একশো শাড়ি এসেছে। তার ভিতর থেকে দশটা শাড়ি এখনই পছন্দ ক'রে ফেলতে হবে।

একটি চিঠি লিখে এখনি হিমাদ্রির বিশ্বাসের ভুল ভেঙ্গে দিতে পারা যায়। সত্যি তোমার কোন অপরাধ নয় হিমাদ্রি, অপরাধ আমার; আমিই মনের একটা মুখর খেয়ালের ঝোঁকে, একটা স্বপ্নের ঘোরে কয়েকটা অদ্ভুত কথা বলে ফেলেছি। বড় কষ্ট হচ্ছিল হিমাদ্রি; তাই প্রলাপ বকেছিলাম। কিন্তু তুমি বিশ্বাস করলে কেন? সত্যিই বিশ্বাস করেছ কি?

হিমুর ঠিকানা জানা নেই, তাই চিঠি লেখা সম্ভব হবে না। কিন্তু···ঠিকানাটা জানা থাকলেই বা কি হতো? অস্বীকার করে না যুথিকা, হিমাদ্রির মত মানুষের সঙ্গে এক ট্রেনের এক কামরায় একই সীটের উপর পাশাপাশি বসে গল্প করতে গিয়ে যা মন চায় তাই অনায়াসে বলে দিতে পারে উদাসীনের মত বাড়ির মেয়ে; কিন্তু উদাসীনের দোতলায় এই ঘরে বসে কাগজ কলম নিয়ে হিমাদ্রিকে একটা চিঠি লেখাও যে নিতান্তই অসম্ভব।

হিমাদ্রি যদি হঠাৎ এই ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় আর প্রশ্ন করে, সব কথা মনে আছে তো যুথিকা? কল্পনা করতেও ভয় পেয়ে থরথর ক'রে ওঠে যুথিকা ঘোষের নিঃশ্বাস। হিমাদ্রি যদি ঝোঁকের মাথায় এরকম একটা কাণ্ড ক'রে বসে, তবে কি উপায় হবে? বাবা ছুটে আসবে; মা ছুটে আসবে। হিমাদ্রির মুখের দিকে কটমট করে তাকিয়ে তার পর যুথিকার

মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করবে সবাই, এ লোকটা কোন্ সাহসে এসব কথা বলছে যূথিকা? এ লোকটার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি?

না, কোন সম্পর্ক নেই। জানি না, লোকটা কোন্ সাহসে এমন কথা বলে। ভয় পেয়ে, কেঁদে আর চেঁচিয়ে একটা কাণ্ড করতে পারবে যূথিকা, কিন্তু বলতে পারবে না যে, আমিই ওকে একথা বলবার সাহস দিয়েছি। হয়তো পুলিশ ডাকবে উদাসীন, এবং উদাসীনের মেয়ের মিথ্যে কথা প্রমাণ করবার সাধ্যি হবে না হিমাদ্রির। কোনও প্রমাণ নেই, কেউ সাক্ষী নেই।

এমন অপমানের মধ্যে এগিয়ে আসবার সাহস হবে কি হিমাদ্রির? ভয়ানক ভুল করবে, যদি সাহস করে। দু'হাতে মাথাটাকে শক্ত করে টিপে ধরে মনে মনে যেন প্রার্থনা করে যূথিকা; এমন সাহস যেন না করে হিমাদ্রি। যেন চুপ করে নিজের ঘরের ভিতরে বসে দিন আর রাতগুলিকে পার করে দেয়; এবং একদিন হঠাৎ চমকে উঠে যেন বুঝতে পারে হিমাদ্রি; পয়লা অঘ্রান পার হয়ে গিয়েছে; বোম্বাই চলে গিয়েছে যূথিকা।

বড় বেশি আশ্চর্য হবে, হতভম্ব হয়ে যাবে, আর কষ্ট পাবে বেচারা। যূথিকা ঘোষের একটা কথা বিশ্বাস ক'রে যে এত শাস্তি পেতে হবে, কল্পনাও করতে পারছে না হিমাদ্রি। তার চেয়ে ভাল, আর এক মুহূর্ত দেরি না ক'রে গিরিডি ছেড়েই চলে যাক না, পালিয়ে যাক না হিমাদ্রি; তাহলে তো আর এই শাস্তি পাওয়ার দুর্ভাগ্য সহ্য করতে হবে না। কিন্তু সেটুকু বুদ্ধি আছে কি হিমাদ্রির? মানুষটা যে বোকা হবার ভুলেই জীবনে শুধু মানুষের যত তুচ্ছতা আর তাড়া খেয়ে বেড়াচ্ছে। ওকে হিমাদ্রি বলেও কেউ ডাকে না। চলে যাক, চলে যাক হিমাদ্রি।

ফুঁপিয়ে উঠলেও, আর বার বার রুমাল দিয়ে চোখ মুছলেও

যূথিকা ঘোষের মনের প্রার্থনাটা যেন হিমাদ্রি নামে একটা মানুষকে এই মুহূর্তে গিরিডি থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্য নিষ্ঠুর চাবুকের মত ছটফট করতে থাকে। পয়লা অঘ্রানের উৎসব বন্ধ করবার সাধ্যি নেই যার, যূথিকা ঘোষকে ভয় পাইয়ে দেবার কিংবা জব্দ করবার মত একটা ভ্রূকুটি করবারও শক্তি নেই যার, সে-মানুষ মানে মানে এখনও সরে পড়ে না কেন?

পয়লা অঘ্রানের আগের দিনেই হঠাৎ গিরিডিতে এসে পড়লেন পাটনার মামী। কুসুম ঘোষ আশ্চর্য হন—এ কি কণিকা? রওনা হবার কথা একটা টেলিগ্রাম ক'রে জানিয়ে দিতে হয়!

মামী বলেন—টেলিগ্রাম করবারও সময় ছিল না কুসুমদি।

কুসুম ঘোষ—নরেন আর বরযাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে আসবে কে?

মামী—অরুণের বাবাই আসবেন। উনিই সব ব্যবস্থা করেছেন। আমি একটা দুশ্চিন্তা নিয়ে, বাধ্য হয়ে আগেই চলে এলাম।

—দুশ্চিন্তা? আতঙ্কিত হয়ে ভীরু চোখে তাকিয়ে থাকেন কুসুম ঘোষ।

—হ্যাঁ, যূথিকা কোথায়?

—মেয়ে তো গিরিডি পৌঁছবার পর থেকে ওপরতলার ঘরটিতে সেই যে ঢুকেছে, সহজে আর নড়তে চায় না।

—কি বলে যূথিকা?

—কিছু না।

—একেবারে কিছু না?

—মাঝে একবার তোমাকে একটা টেলিগ্রাম করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

—কিসের জন্য?

—তা জানি না। কিছুক্ষণ এঘর-ওঘর ক'রে, আর গজ গজ ক'রে, তারপর নিজেই চুপ হয়ে গেল।

—আর কোন কাণ্ড করেনি ?

—কাণ্ড ? না, কাণ্ড আর কি করবে বল ? হ্যাঁ, অনেকক্ষণ ধরে একটা চিঠি লিখেছিল, বোধ হয় নরেনের কাছে। কিন্তু হঠাৎ নিজেই আবার চিঠিটাকে কুটি কুটি ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটা লম্বা ঘুম দিলো। কাণ্ড বলতে এই তো কাণ্ড।

—বিয়ে করতে কোন আপত্তির কথা বলেছে কি ?

—কোন আপত্তির কথা বলেনি, বরং নিজেই তো বেশ দেখে-শুনে দশটা শাড়ি বাছাই করেছে ; শর্মা ব্রাদার্সের দোকান থেকে একশ'টা শাড়ি এসেছিল। বিয়ের নিমন্ত্রণের ব্যাপার নিয়েও নিজের থেকেই যেচে দু'চারটে ভাল ভাল কথা বলেছে।

কি কথা ?

—যূথিকার ইচ্ছে, বিয়েতে যেন হিমু-টিমুর মত লোককে নিমন্ত্রণ না করা হয়।

মামী খুশি হয়ে হেসে ফেলেন—যাক্, নিশ্চিন্ত হলাম। এইবার মেয়ের কাণ্ডজ্ঞান হয়েছে। কিন্তু ওদিকে একটা কাণ্ড হয়ে গিয়েছে।

—অ্যাঁ ?

—নরেন আমাকে তিনবার জিজ্ঞাসা করেছে, হিমাদ্রি নামে লোকটার সঙ্গে আপনাদের কি সম্পর্ক ?

চেঁচিয়ে ওঠেন কুসুম ঘোষ—কোন সম্পর্ক নেই। হিমাদ্রি একটা চাকর গোছের লোক। মাথায় ছিট আছে। লোকটাকে কোন কাজ ক'রে দিতে বললেই তেড়েমেড়ে এসে কাজ ক'রে দিয়ে চলে যায়।

—কিন্তু হিমাদ্রির সঙ্গে যূথিকার সম্পর্কটা কি দাঁড়িয়েছে ?

—ছি ছি ; তুমি কি বিশ্রী বাজে কথা বলছো কণিকা ?

—একটুও বাজে কথা নয় কুসুমদি।

—খুব বাজে কথা।

—না, নরেনও নিজের চোখে কিছু কিছু দেখেছে। আমি অনেক কিছুই দেখেছি।

—কি দেখেছো তুমি ?

—হিমাদ্রির সঙ্গে বিশ্রীরকমের বন্ধুত্ব করেছে যূথিকা।

—কি আশ্চর্য, এমন অসম্ভব কেমন করে সম্ভব হয় ?

—সম্ভব তো হলো, আশ্চর্য হয়ে লাভ নেই।

—দুশ্চিন্তা করেও লাভ নেই। চেঁচিয়ে ওঠেন কুসুম ঘোষ।

—কেন ? একটু আশ্চর্য হন কণিকা।

কুসুম ঘোষ—ভয়টা কিসের ? চুলোয় যাক্ হিমাদ্রি।

কণিকা—কিন্তু নরেনকে তো আর চুলোয় ঠেলে দিতে পারেন না কুসুমদি ?

—কখ্খনো না। কিন্তু নরেনের কথা তুলছো কেন ?

—নরেনের মন বড় অহঙ্কারী মন। এসব ব্যাপারের সামান্য আভাসও জানতে পেরেছে কি বেঁকে বসবে। যূথিকাকে বিয়ে করতে কোনমতেই রাজি হবে না।

—কিন্তু নরেন জানবে কি ক'রে ?

—জানিয়ে দেবে হিমাদ্রি।

—সে ছোটলোকের এত সাহস হবে ?

—আপনার মেয়ে যদি ছোটলোককে সাহস দিয়ে থাকে তবে…।

স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন কুসুম ঘোষ। চারু ঘোষও শুনলেন ; সির সির ক'রে কাঁপতে থাকেন চারু ঘোষ। চারু ঘোষের জীবনের নিরেট অহঙ্কারটাই যেন ভয়ে সির সির ক'রে উঠেছে। হিমু দত্ত নামে একটা লোক, যে লোকটা বলতে গেলে একটা মানুষই নয়, তারই

অহঙ্কারের কাছে যেন মাথা হেঁট ক'রে, ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে আর ধূলো হয়ে লুটিয়ে পড়েছে তিনতলা উদাসীন।

কণিকা বলেন—নরেন বলেছে, গিরিডিতে এসেই প্রথমে হিমাদ্রি নামে লোকটার সঙ্গে আলাপ করতে হবে।

চারু ঘোষ হতভম্বের মত তাকিয়ে বলেন—এটা তো নরেনের মনের একটা ভয়ানক সন্দেহের কথা হলো।

কণিকা বলেন—সেই জন্যেই তো আমি আগেভাগে চলে এলাম। একটা ব্যবস্থা করতেই হয়। হিমাদ্রিকে সরিয়ে না দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হতে পারা যাবে না।

চারু ঘোষ—কি ক'রে সরানো যায়? ওকে টাকা সাধলেও সরে যেতে রাজি হবে বলে মনে হয় না।

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করেন কণিকা। তাঁরও চার বছরের চেষ্টার ইতিহাস এমন করে ভুয়ো হয়ে যাবে, এ দুঃখ যে কণিকারও এতদিনের জেদের একটা ভয়ানক পরাজয়ের দুঃখ। শীতাংশু ডাক্তার যে হেসে হেসে আটখানা হয়ে যাবে, নরেনের মা অভিশাপ দেবেন, এবং গর্দানিবাগে কোন ভদ্রলোকের বাড়িতে মুখ দেখাতে পারবেন না কণিকা, যদি এই বিয়ে ভেঙ্গে যায়।

আস্তে আস্তে সিঁড়ি ধরে উপরতলায় উঠে যূথিকার ঘরের দিকে এগিয়ে যান এবং দরজার কাছে এসেই হেসে ওঠেন কণিকা মামী। —চুপটি ক'রে বসে কি করছো যূথিকা?

চমকে ওঠে যূথিকা—কিছু না। তুমি কখন এলে?

মামী—এই তো সকাল নটার গাড়িতে পৌঁছেছি। শুনলাম, তুমি নাকি আমাকে একটা টেলিগ্রাম করতে চেয়েছিলে?

যূথিকা—হ্যাঁ। কিন্তু করিনি তো? এত ভয় পাচ্ছ কেন?

মামী—নরেনের কাছে কি একটা চিঠি লিখতে চেয়েছিলে?

—হ্যাঁ।

—তবে লিখলে না কেন ?

—লেখবার দরকার আর হলো না।

—ওরা সবাই কাল সকাল নটার গাড়িতে এখানে পৌঁছে যাবে।

যূথিকা হাসে—তুমিও বরযাত্রিণী হয়ে ওদের সঙ্গেই এলে পারতে ; একদিন আগে এসে লাভটা কি হলো ?

মামী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যান।—আসতে বাধ্য হয়েছি।

—কেন ?

—বিয়ে ভেঙ্গে যাবার ভয় আছে।

ভয় পেয়ে শিউরে উঠে যূথিকা। মুখ কালো ক'রে আস্তে আস্তে বলে—কেন মামী ? কি ব্যাপার হলো ?

—হিমাদ্রিকে বিশ্বাস নেই।

যূথিকার হৃৎপিণ্ডের সাড়া বোধ হয় এই মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যাবে! হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে জোরে শ্বাস টানতে চেষ্টা ক'রে যূথিকা প্রশ্ন করে।—কি করেছে হিমাদ্রি ?

—কিছু করেনি এখনো, কিন্তু কিছু একটা করবে বলে বুঝতে পেরেছি।

—কি ?

—নরেনের কাছে ভয়ানক কোন কথা বলে দেবে।

—বলুক না, নরেন বিশ্বাস করবে কেন সে কথা ?

—নরেন বিশ্বাস ক'রে ফেলবে বলে ভয় হচ্ছে।

—কেন ?

—নরেনের মনে একটা খট্‌কা আছে বলে মনে হচ্ছে।

—অকারণে একটা খট্‌কা। বেশ মজার খট্‌কা তো।

—অকারণে নয়। পাটনাতে ট্রেনে ওঠবার সময় তুমিই নরেনের চোখের সামনে হিমাদ্রি হিমাদ্রি ক'রে চেঁচিয়ে আর উতলা হয়ে যে কাণ্ড করেছিলে, তাতে নরেনের মনে কোন খট্‌কা লাগলে সেটা কি দোষের হবে ?

—এ-সবই তো তোমার অনুমান। নরেনকে ছোট ক'রে ভাবতে তোমার ইচ্ছে করছে।

—নরেন নিজেই সন্দেহের কথা বলে আমাকে ভাবিয়ে দিয়েছে।

—কি বলেছে নরেন?

—গিরিডিতে এসেই প্রথমে হিমাদ্রির সঙ্গে আলাপ করবে।

দু'চোখ অপলক করে তাকিয়ে থাকে আর বিড়বিড় করে যূথিকা।—নরেনের মত মানুষ হিমাদ্রির মত একটা লোকের সঙ্গে আলাপ করবে কেন?

—সেটা বুঝতে চেষ্টা কর।

—কি জানতে চায় নরেন?

—সেটা বুঝে দেখ।

—হিমাদ্রিই বা কি এমন অদ্ভুত কথা বলে দেবে?

—তুমি জান।

যূথিকা ঘোষের মাথাটা এবার অলস হয়ে ঝুঁকে পড়ে। যূথিকা ঘোষের জীবনের পয়লা অঘ্রানের উৎসবকে ভেঙ্গে গুঁড়ো ক'রে দেবার শক্তি আছে হিমাদ্রির। নরেনের মনের এই খট্‌কা যে হিমাদ্রির জীবনের একটা সৌভাগ্য। চারু ঘোষের মেয়ের ছলনার জ্বালায় শুধু চুপ ক'রে পুড়ে মরে যাবে না হিমাদ্রি। বিনা দোষের শাস্তি আর অপমান মাথা পেতে সহ্য করবে না, যতই মাটির মানুষ হোক না কেন হিমাদ্রি। নরেনকে অনায়াসে বলে দিতে পারবে হিমাদ্রি; হ্যাঁ, চারু ঘোষের মেয়ে আমারই হাত ধরে আমাকে বলেছিল, বোম্বাই যেতে চাই না।

মামী বলেন—ছোটলোকের রাগের কোন বিশ্বাস নেই যূথিকা।

যূথিকা ঘোষের মাথাটা আরও ঝুঁকে পড়ে। বিশ্বাস করা যায় না ঠিকই, কিন্তু ছোটলোকের মত রাগ করেছে কে? হিমাদ্রির মনের প্রতিহিংসাটা, না নরেনের মনের ঐ খট্‌কাটা?

মামী বলেন—এখনই সাবধান হয়ে একটা ব্যবস্থা করে ফেলা উচিত যূথিকা।

ঝুঁকে পড়া মাথাটাকে আরও নামিয়ে দিয়ে আর হাত তুলে যেন লুকিয়ে লুকিয়ে চোখ ঘষে যূথিকা। হ্যাঁ, সাবধান হওয়া উচিত, একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেলা উচিত, নইলে পয়লা অঘ্রানের সন্ধ্যায় উৎসবহীন উদাসীনের অন্ধকারে ঢাকা চেহারার দিকে তাকিয়ে হাততালি দেবে গণেশবাবুর বাড়ির লোকগুলি। হো হো করে হেসে উঠবে হিমাদ্রি। ছি ছি, হিমাদ্রিও স্বপ্নের ঘোরে একটা মিথ্যে কথা বলেছিল। সত্যি ভালবেসে থাকলে কি এরকম ভয়ানক প্রতিশোধ কেউ নিতে পারে ?

এক গাদা টাকা ওর হাতে তুলে দিয়ে বলা যায়, চলে যাও হিমাদ্রি। কিন্তু তাতে কোন ফল হবে কি ?

ভ্রুকুটি করে বলা যায়, কিন্তু তাতেও কোন ফল হবে না মনে হয়। ভ্রুকুটিকে ভয় করবে কেন হিমাদ্রি ?

ক্ষমা চেয়ে বলা যায়, চলে যাও হিমাদ্রি। কিন্তু তাতে কি চলে যেতে রাজি হবে ? ক্ষমা করবে কেন ?

যদি একটা সুন্দর নকল হাসি হেসে ওর কানের কাছে একটা সুন্দর কথা ঘুস দেওয়া যায়, আমিই তো মনে মনে তোমার চিরকালের জিনিস ; তাতেও কি কোন ফল হবে ?

চলে যেতে রাজি হবে না, চারু ঘোষের মেয়ের কথা বিশ্বাসই করবে না হিমাদ্রি।

—যদি ভালবেসে থাক, তবে চলে যাও হিমাদ্রি! যূথিকা ঘোষের নীরব ঠোঁট দুটো যেন হঠাৎ মনে পড়া একটা মন্ত্রকে ধরতে পেরে ফিসফিস ক'রে ওঠে। যূথিকার বন্ধ চোখ, ভেজা চোখ দুটোও যেন দেখতে পায়, যূথিকার কথা শোনা মাত্র গিরিডি ছেড়ে ছুটে চলে গেল হিমাদ্রি। আর, একবারও ফিরে তাকালো

না। যূথিকাকে বিশ্বাস না করুক, নিজেকে যে বিশ্বাস করে হিমাদ্রি। এইবার, এই কথা শোনবার পর না চলে গিয়ে পারবে কেন ?

ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে যূথিকা বলে—আমি একবার বাইরে ঘুরে আসছি মামী ; তোমরা ভয়-টয় পেও না।

মামী উদ্বিগ্নভাবে বলেন—বেশ তো, আমিও না হয় তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।

যূথিকা হাসে—চল।

লোহার পুল পার হয়েই বাঁ দিকের সরু সড়ক। পথের দু'পাশে সরু ড্রেনের শেওলা খুঁটে খায় পোষা হাঁসের দল। মাঝে মাঝে ছাই-এর গাদা ; তারই পাশে ছড়ানো এঁটো-কাঁটা নিয়ে কাকে কুকুরে ঝগড়া করে।

বড় রাস্তার উপর গাড়ি থামিয়ে এই সরু সড়কের দিকে হাত তুলে দেখিয়ে দেয় ড্রাইভার গিরধারি—ওই যে দিয়ালকে উপর লাগা হুয়া ছোটা সাইন বোর্ড দিখাচ্ছে, বাস্, ওহি আছে হিমুকা ঘর।

এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় যূথিকা। মামীও যূথিকার পাশে থমকে দাঁড়িয়ে থাকেন। হ্যাঁ, এই তো হিমাদ্রির ঘর। দরজার পাশে দেয়ালের গায়ে এক টুকরো কাঠের উপর বড় বড় হরফে লেখা, ডাক্তার হিমাদ্রিশেখর দত্ত, হোমিও।

—কাকে চাই ?

হিমুর ঘরের মাথার উপরে একটা ছোট ঘরের ঘুলঘুলির কাছে একজোড়া চোখ ভাসিয়ে প্রশ্ন করে একটা লোক।

যূথিকা—হিমাদ্রিবাবুকে চাই।

—সে ইখানে নাই। গিরিডি ছোড়কে চলিয়ে গিয়েছে।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে যূথিকা।—হিমাদ্রি নিজেই চলে গিয়েছে মামী।

একটা ঢোঁক গিলে নিয়ে ছটফট ক'রে, আরও উৎফুল্ল হয়ে, চোখের তারা দুটো আরও ঝিকমিকিয়ে, আরও জোরে চেঁচিয়ে হেসে ওঠে যূথিকা—হিমাদ্রি আমাকেই বিশ্বাস ক'রে পালিয়ে গিয়েছে মামী।

হাসি থামাতে গিয়ে যূথিকার শরীরটা কাঁপতে থাকে; শরীরের কাঁপুনিটা থামাতে গিয়ে আস্তে হাত তুলে দেয়ালটাকে ধরতে চেষ্টা করে যূথিকা। আর, দেয়ালটা ধরতে গিয়ে সেই ছোট কাঠের ফলকটা ছুঁয়ে ফেলে। এবং কাঠের ফলকটাকে ছুঁতে গিয়ে বড় বড় হরফে লেখা সেই নামটাকেই যেন আঁকড়ে ধরে যূথিকা।

একটা নাম মাত্র। কে জানে কবে কাঠের ঘুনে এই নামটাকেও কুরে কুরে খেয়ে প্রায় মুছে ফেলবে। দেখলেও বুঝতে পারা যাবে না, কার নাম আর কি নাম?

মামী বলেন—চল যূথিকা।